পাতাল পথে ডকটর কয়াল

প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়

—ঃ পরিবেশক ঃ—

অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির

এ ১৮এ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশ কাল—১লা মে ১৯৬২

ঃ প্রকাশক ঃ
মমতা মুখোপাধ্যায়
১২/১এ তন্নুপুকুর রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩১

মুদ্রক ঃ
কালিকা জব প্রেস
১০৯বি কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ/স্কেচ
সুব্রত ত্রিপাঠী
কলিকাতা-৭০০০৩৩

রঞ্জন হাবলু বুড়ো কচি কে—

সূচীপত্র

পাতাল পথে ডকটর কয়াল

ডকটর 'কে' যাচ্ছেন। পেছনে আমি আর নিমাই। দিগন্ত বিস্তৃত এই মাঠের শেষে তাকাও মনে হবে, আকাশ মাটি ছুঁয়েছে।

—বুঝলে নিতাই, মাঝে মাঝে আমি কেন কলকাতায় ফিরে আসি ?

—নিতাই নয় মামা, নিমাই। আমি মামাকে সংশোধন করে দিলাম।

ডকটর কয়াল পেছনে ফিরে তাকালেন। আমাকে ইন্টারফেয়ার কোর না। নিতাইও যা নিমাইও তা। সামান্য ত'ম নিয়ে দেরী কোরে দিও না। সাইবেরিয়া থেকে কেন ফিরে এলাম জান? ওখানে কি আমার খাতির কম হয়েছিল, না ওখানে এতবড় দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ ছিল না ? আমরা চুপচাপ মুখচাওয়াচায়ী করে শেষে প্রশ্ন করলাম. কেন মামা ?

—এই বাদাম। —এই—দেখত রঞ্জন একশ বাদাম কত নেয়। ডকটর কয়াল পকেট থেকে এক টাকার নোট একখানা বার করে দিলেন।

বাদামওয়ালা বাদাম ওজন করে খুচরো ফেরৎ দিয়ে চলে গেল। ডক্‌টর কে বললেন আর এগুব না এস এইখানটায় বসি, বলে ডক্‌টর কয়াল ধপাস করে ঘাসের ওপর বসে পড়লেন। আমরাও বসলাম আর বাদাম খেতে খেতে প্রশ্ন করলাম, মামা সাইবেরিয়ায় খুব ঠাণ্ডা না ?

—নন্‌সেন্‌স। ঠাণ্ডা নয়ত কি ! গরমে তোমার ঘাম ঝরবে? —কিন্তু তোমাদের মামার কাছে আবহাওয়া একটা ব্যাপারই নয়, বুঝলে। বলতে বলতে ডক্‌টর কয়াল বাদাম ভাঙতে গিয়ে আঙুলে

ব্যথা পেলেন। —বাদামগুলো টুপিডের মত শক্ত।

নিমাই আর আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করলাম। সাইবেরিয়ায় মামার তাই গিয়ে ঠাণ্ডা লাগেনি। —তুই আমি গেলে নিঘ্যাৎ নিমোনিয়া হয়ে যেত—সারা বছর বরফ পড়ে থাকে—তুষার ঝড়……

…কেন তোমাদের নিমোনিয়া হবে? আমি থাকতে ঠাণ্ডা লেগে আমার ভাগ্নেদের নিমোনিয়া হবে, ডক্টর 'কে' অফ ইণ্ডিয়া কি মরে গেছে। ডক্টর 'কে' বাদাম চেবাতে চেবাতে কট্‌মট্ করে আমাদের দিকে তাকালেন। —জান ডক্টর কয়াল গত পরশু সাইবেরিয়া থেকে সবকিছু ডেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফিরছেন।

—জানি মামা।

—জান তাহলে মূর্খের মত কথা বলছ কেন। এখানকার এক-নম্বর মূর্খটির মত স্বর্গরাজ্যে বাস কর নাকি? ডকটর কে এমন একটা রিপেলার বার করেছে যেটা এড্‌জাষ্ট করে পাশে বসিয়ে চালিয়ে দাও তুমি যে টেম্প্রেচারটি চাও তাই পেয়ে যাবে। —বুঝলে? মনে কর অগ্রাণ মাসের শেষের দিকের তাপটি তোমার খুব পছন্দ—রিপেলারে সেই তাপ এড্‌জাষ্ট করে তোমার ঘরে চালিয়ে রাখ সারা বছর অগ্রাণ মাসের মত মিঠে শীত উপভোগ করবে।

—বাঃ কি সুন্দর জিনিস মামা। —আপনি তৈরী করুণ আমরা বাজারে ছাড়ি। একবছরে লাখোপতি। নিমাই উচ্ছ্বাসে কথাগুলো বলল।

ডক্টর কয়াল বললেন, লাখোপতি রঘুপতির চেলাদের হতে দাও—এ নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না। ওসব বাজারে ছাড়লে আর দেখতে হচ্ছে না। তখন হবে আরাম—হায়, রাম কে নিয়ে আরামের মধ্যেই রাম আছেন।

—রিপেলারটা কিসে চলে মামা?

—অন্য আর একটি গ্রহ আছে যারা এ কাজে বাধা দিতে চায়, তারাই ঝড় সৃষ্টি করে আমার স্টেশন ভেঙ্গে দিল।

—এত সাংঘাতিক মামা। গ্রহে গ্রহে রেশারেশী। ভাগ্য ভাল আপনাকে মেরে ফেলেনি।

—না-না আমাকে কেউ মেরে ফেলবে না। আমাকে ওদের প্রয়োজন। ডক্টর কয়াল হাসলেন।

আমরা মামার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মামা হাসলেন কেন বোঝবার চেষ্টা করলাম।

সন্ধ্যা, আর এক পোচ তরল ধূসর রং টানতে টানতে মাঠের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে সমান ছোপ ফেলতে লাগল।

—এমনই এক সন্ধ্যা নেমে আসছিল সেদিন সাইবেরিয়ার বুকে, আমি একা ল্যাবোরেটরীতে বসেছিলাম। আমাকে কফি দিয়ে গিয়েছিল খালি কাপটা পাশের টেবিলে রাখা ছিল। আমার কাছে একটা রিসিভার ছিল যেটা অন্য গ্রহের সংকেত এবং শব্দ ধরতে পারে এই ভাবেই তৈরী করা। হঠাৎ শুনলাম কে যেন বলল ডাক্তার 'কে'। আমি চমকে উঠলাম। আজ থেকে পঁয়তিরিশ বছর আগে আমার কাছে একটি মেয়ে রিসার্চ করত গলার স্বরটা ঠিক তার মত। আমাকে 'ডাক্তার কে' বলে ডাকত। আমি তাড়াতাড়ি উঠে জানালার কাছে গেলাম। পর্দা সরিয়ে বাইরে দেখলাম তুষার পাত হচ্ছে। —কই কেউ নেই! তাহলে শব্দটা কি আমি ভুল শুনলাম। অন্য গ্রহ থেকে কেউ ডাকল না ত!

—কিন্তু অন্য গ্রহ হবে কি করে। গলার স্বরটা ত পরিচিত।

—তারপর কী হল মামা?

—তার পরের দিন ফ্লাইং মগ নামল। ফ্লাইং মগ সম্পর্কে আমি সঠিক ডেটা বের করতে পারলাম না কারণ কাজটা আমার পক্ষে আর একটু সময় নেবার ছিল। যাই হোক রাত্রে ফ্লাইং মগ কোন গ্রহ থেকে আসতে পারে তার সম্ভাবনা গুলো অঙ্ক কষে দেখছিলাম।

দেখতে দেখতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন আমি তাড়াতাড়ি উঠে সেই রাত্রেই আমার ক্যাম্প ল্যাবরেট-রীতে গিয়েছিলাম। তখন কোন ঝড় ছিল না। অবস্থা স্বাভাবিক ছিল বলা চলে। তবে অন্যমনস্ক ছিলাম বলে সঙ্গে রিপেলারটা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

—আপনার শীত করেনি মামা সঙ্গে রিপেলারটা যে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

—শীত নিশ্চয় করেছিল কিন্তু তখন অন্যমনস্ক ছিলাম তাই বুঝতে পারি নি। আমি ক্যাম্পে বসে আগুনের কাঠ একটু টেনে দিয়ে ট্রান্সমিটার ঠিক করতে লাগলাম। সিগন্যাল জেনারেটরে কত গুলো রিপিল্স আসছিল সেইগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখছিলাম, হঠাৎ সেই আওয়াজ—ডাক্তার কে'। আমার কি ভুল হল, আমি ভুল শুনলাম? আবার কাজে লাগলাম। আবার সেই ডাক—বাইরে এলাম। কই, কেউ নয় ত। না আর ডাক এলেও শুনব না। কিছুক্ষণ কাজ করছি আবার-'ডাক্তার কে' ডাক। কাজ করতে লাগলাম। কিন্তু কাজ করতে পারছিলাম না, অন্য মনস্ক হয়ে পড়-ছিলাম। হঠাৎ মনে হল ক্যাম্পের পর্দার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে। আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলাম। কারুকে দেখতে পেলাম না। অনেক দূর পথে এগিয়ে গেলাম, তবু কিছুই দেখতে পেলাম না। একটা নেশার মত হয়ে গেল, শুধু প্রশ্ন জাগছে, ও আমায় কেন ডাকল—কোথায় গেল? অনেক দূরে চলে এসেছি। হুঁশ হল এ আমি কোথায় যাচ্ছি-আমি কোথায়? ফিরে এলাম। যখন ফিরছি ঝড় উঠল। বেশ ঝড়—ঝড় যেন বাড়ছে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছি। দূর থেকে দেখতে পেলাম কাঠের আগুন গুলো ছড়িয়ে পড়ছে—ক্যাম্পটা উড়ে বেরিয়ে গেছে। আগুন বেশীদূর এগুতে পারল না নিভে গেল। কিন্তু আমার সব গেল। সব ঝড়ের

মুখে তাল গোল পাকিয়ে গেল, কিছুই পেলাম না। সেই দুঃখে সাইবেরিয়া থেকে চলে এলাম।

—ওই ডাকটা কি আপনার মনের ভুল ছিল মামা!

—না ও ডাকটা মনের ভুল ছিল না। ওই ডাক তৈরী করে আমাকে ক্যাম্প থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর সব নষ্ট করে দিল। —আমাকে মারবার মতলব থাকলে ক্যাম্প থেকে আমাকে ভুলিয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত না।

--তারপর কী হল মামা? নিমাই জিগ্যেস করল।

—আমি পাগলের মত খুঁজতে লাগলাম, ওদের পাঠানো সেই সাংকেতিক শব্দ গুলো, যেগুলো আমার নোট বুকে তোলা ছিল, সেটা পেলাম না। খুঁজতে খুঁজতে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে খেয়াল নেই হঠাৎ নজরে পড়ল, ভাল্লুকের মত দুপায়ে ওটা কি দাঁড়িয়ে রয়েছে! গায়ের রং সাদা-ছোট ছোট সাদা লোম যুক্ত! —শ্বেত-ভল্লুক নাকি? সর্ব্বনাশ এক্ষুণি আমায় আক্রমণ করবে……। সাইবেরিয়ায় শ্বেত ভল্লুক থাকে, ওরা মানুষকে আক্রমণ করে। ভীষণ সাংঘাতিক। কিন্তু শ্বেত ভল্লুক ত' দুপায়ে চলে না—ওই, চলে বেড়াচ্ছে। মনে হল আমার দিকে এগিয়ে আসছে। দুপায়ে চলছে, ঠিক মানুষের মত হাত দুটো দুপাশে দুলছে। তাহলে ওটা কি মানুষ?…তুষার মানব! তুষার মানব কেউ দেখে নি। কেমন দেখতে ধারণা নেই, তবু আমার সঠিক অনুমান হল-ওটাই তুষার মানব। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমার ধারণা যে সঠিক নয় তা বুঝতে পারলাম।

—কেন মামা?

—কারণ ওর হাতে একটা টর্চ জ্বলে উঠল। ঠিক টর্চ বলব না, আলোর সঙ্গে কতগুলো শব্দ বেরিয়ে আসছে। কি যেন বলল, ওর ভাষা আমি বুঝতে পারলাম না। আমি মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আলো নিভে গেল আবার আলো জ্বলে উঠল। এবার পরিষ্কার ইংরিজীতে আলোর সঙ্গে কথাগুলো বেরিয়ে এল, জয়েন হ্যাণ্ডস্ উইথ আস ডকটর কে'। কম টু আওয়ার ক্যাম্প! তারপর লোকটা তীব্র গতিতে হঠাৎ বহু দূরে কি করে যেন চলে গেল।

একটা দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি হল, একটা ফ্লাইং মগ উড়ে যেতে দেখলাম।

—মগটাকে আগে আপনি লক্ষ্য করেন নি মামা? আমি প্রশ্ন করলাম।

—না দেখতে পাইনি। আমি পাগলের মত আমার কাগজ খুঁজছিলাম দেখব কি করে! যাই হোক ফ্লাইং মগকে আর দেখতে পেলাম না।

—আর সেই তুষার মানব কে?

ওটা তুষার মানব কিনা বলতে পারব না। মগ উড়ে যাবার পর ওকেও আর দেখতে পেলাম না। ও অন্য গ্রহেরই মানুষ। মগের সঙ্গে এসেছিল। পরে আমি সব কিছু অঙ্ক করে বুঝেছিলাম।

—'ডকটর কে' বলে কি ওই মানুষই আপনাকে ডেকেছিল?

—হ্যাঁ ওরাই ডেকেছিল। অদ্ভুত ওরা বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেছে। কোন্ ডাক আমায় সহজে বের করে আনতে পারবে তা ওরা অনুধাবন করেছে। ওরা আমার সব অবস্থার মনের কথাও হয়ত গড়গড় করে বলে দিতে পারবে। তবে ওদের ডেস্ট্রাকটিভ মনোভাব আমি মানতে পারি না।

—ডেস্ট্রাক্টিব কেন?

—সেটা ওদের পলিসি। মুখে যদিও ওরা বলে সমস্ত আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ, আর যাতে কোন গ্রহে আণবিক অস্ত্র তৈরী না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। শান্তির জন্যে এটাকে কাজে লাগাতে হবে ইত্যাদি। সমস্ত আণবিক অস্ত্র, এস সবাই মিলে ধ্বংস করে ফেলি, এ কথাটা চেপে যায়। সেই জন্যে আমাকে ওদের ক্যাম্পের সঙ্গে হাত মেলাতে বলছে—ওরা অন্যের আণবিক অস্ত্র ধ্বংস করবার ক্ষমতা অর্জন করতে চায়—এটাই আমি বুঝতে পারছি···। যাক ওসমস্ত জটিল ব্যাপার নিয়ে তোমরা মাথা ঘামালে বিজ্ঞান কিছুই করা হবে না। ডকটর কয়াল থামলেন। ভাঁড়ের চা আর একটু পাওয়া যাবে না। ওই তো ঘড়ার চা যাচ্ছে। অন্ধকারে ল্যাম্পের শিখা কেমন কাঁপতে কাঁপতে এগুচ্ছে। ডাকতো—ডাক তো হারুণ।

চাওয়ালা এল। নেকড়াচিম্‌টে দিয়ে টিপে পাঁচনের রস বের করে ঘড়া থেকে চা ঢেলে জায়কেদার বানিয়ে আগে ডকটর কে কে দিল। আমাদের তিন জনের হাতে ভাঁড়। মগের শেষ চা টুকু ডকটর কয়ালের ভাঁড়ে চাওয়ালা ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

—এই চা-টা আমার ভারী চমৎকার লাগে। পিজি ষ্টার্ট হলে এ চা বেচে অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করতে বলব দিল্লী অয়ালাদের।

—কিন্তু চা বিক্রি করতে গেলে এই রকম ঘড়া নিয়ে লোক লাগবে। আপনি ত' বলছেন পিজিতে আপাততঃ মানুষ যাবে না শুধু মালবাহী হবে। নিমাই কথাগুলো বলল।



…আমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ডক্‌টর কে বললেন, হোক না, মানুষ যাবে না, অটোমেশন সিস্টেমে বিক্রি হবে। অবশ্য ইচ্ছে করলে মানুষ যাবার ব্যবস্থা কি করা যায় না। আমার যা অভিজ্ঞতা হল, তাতে দেখলাম মানুষ নিয়ে যেতে গেলে খরচটা ডবল হয়ে যায়—আর যদি মানুষ ছাড়া যায় তাতে খরচা অতি সামান্য।

—হ্যাঁ এবারকার অভিজ্ঞতা প্রচণ্ড হয়েছে। আপনারা যে বেঁচে ফিরে এসেছেন এটাই আশ্চর্য। আমি কথাগুলো বলে ডক্‌টর কের

দিকে তাকালাম।

ডকটর কে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। সিগারেট আঙুলের ফাঁকে পুড়ছিল। বললেন, প্রথম সফরে যে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এটাই বড় প্রাপ্য। গ্রেনাইট পাহাড়ের আগে যদি চেম্বারটা কণ্ট্রোল হারাত—হারাতেও ত পারত।

—পিজি যখন গ্রেনাইট পাহাড় ডিঙিয়ে অন্য দিকে এল তখন কী হল মামা?

—হঠাৎ আমরা একটা টানেলে পড়লাম। টানেলের মধ্যে পিজি ঢুকে পড়তেই স্পীড কমতে লাগল—কারণ ভেতরে একেবারে ভুষভুষে মাটি—কোথাও বা শূন্য গহ্বর। আমি অন্যভাবে ভাবতে লাগলাম। মাটির এত নীচে এত বড় টানেল কি করে সৃষ্টি হল। আমাদের পিজিকে আমি অন্য পথে নিয়ে যেতে পারি, ডিরেকশন চেঞ্জ করে টানেলের ছাদ ফুঁড়ে মাটির পথে বেরিয়ে যেতে পারি, কিন্তু ভাবলাম এই টানেলের ব্যাপারটা কী, কত লম্বা টানেল দেখতে হবে। পিজির গতি আমি ইচ্ছে করলে একটু বাড়িয়ে নিতে পারি, কিন্তু এই ধরণের টানেল মাটির এত নীচে আমার জ্ঞানের বাইরে, তাই ধীরে ধীরে পিজিকে চালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলাম। মাইক্রোওয়েভ পাঠিয়ে তার কার্ভের বিশেষত্ব লক্ষ্য করতে লাগলাম। প্রায় তিন মিটার যাবার পর টানেলের ডাইমিটার হঠাৎ দ্বিগুণ অনুমান করলাম। সেই জায়গায় অন্য ধরণের আকৃতি নজরে পড়ল। টানেল প্রায় পাঁচ শ' মিটার গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। আবার পিজি নিজের গতিতে চলতে লাগল। লাইট বন্ধ করে দিলাম।

—তাহলে টানেলটা বেশী লম্বা ছিল না মামা।

—তোমার ওটা টানেল ছিল না। ডকটর কয়াল সিগারেটে একটা টান দিয়ে ফেলে দিলেন।

—ওটা টানেল ছিল না? আমরা দুজনেই আশ্চর্য হলাম।

—হ্যাঁ ওটা টানেল নয় ফসিল। ভূপৃষ্ঠ থেকে বহু নীচে এমন ফসিল এর আগে কেউ নজর করতে পারে নি। সেদিক দিয়ে অভিনবত্ব আছে সেটা সকল দেশের বিজ্ঞানীদের এক মত।

—ওটা কিসের ফসিল মামা? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সাপের। ডকটর কয়াল আস্তিন সরিয়ে সময় দেখে নিলেন।

আমরা নির্বাক হয়ে মামার দিকে তাকিয়ে রইলাম। পাঁচশো মিটার লম্বা, কি সাপ!

—প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাপ। ইতিহাস যখন সৃষ্টি হয়েছে তার চেয়ে দশ হাজার বছর আগে এই ধরনের সাপ ছিল।

—এত লম্বা সাপ।

—হয়ত এর চেয়ে লম্বা সাপের হদিস একদিন পাওয়া যাবে। মাটির নীচে প্রথম আমি গেলাম তাই এই অভিজ্ঞতা হল। মনে কর সাপটা যখন জ্যান্ত ছিল, যখন চলে বেড়াত তখন কি রকম দেখতে লাগত?

দেখলেই ত' লোকে অজ্ঞান হয়ে যাবে তাই না মামা!

ডকটর কয়াল জবাব দিলেন না। নিজের মনেই বলতে লাগলেন। এই সাপটা একদিন হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল একটা ব্যাঙের দিকে। খাদ্য খুঁজছিল। চারিদিকে জল আর পাহাড়—জলে বিচিত্র ধরনের উদ্ভিদ। জলের ওপর দিয়ে বা মাঝ দিয়ে সাপটা হামাগুড়ি দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে আত্মগোপন করছিল। ব্যাঙ-টাকে ধরেছিল। মনে কর এই ব্যাঙটার আকৃতি একটা হাতির মত ড়। ব্যাঙটা কিছুক্ষণ পেছনের পাদুটো ছুড়তে লাগল কিন্তু বৃথা। সাপটা ধীরে ধীরে ব্যাঙটাকে গিলে ফেলল, তারপর চুপ করে শুয়ে রইল—সাপের যা ধর্ম। হঠাৎ আরম্ভ হল ভীষণ ভূমিকম্প। তখন অহরহ ভূমিকম্প হত। সেদিন কার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প সব কিছু ওলট পালট করে দিল। হয়ত এমন এক ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল যাতে সাপটা কয়েক মাইল নীচে নেমে গিয়েছিল। তারপর হাজার

হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নীচে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে সাপটা কত মাইল নীচে নেমে গিয়েছিল···সেটাকেই আমি টানেল ভেবেছিলাম। তোমাদের বলি, টানেলের যে জায়গাটায় আমি বলেছিলাম ডাইমিটার হঠাৎ দ্বিগুণ হয়ে গেছে আসলে ওটা পেট ; ওখানে ব্যাঙটা ছিল···এবং আমি ব্যাঙ বলছি কেন, তার কারণ ওই স্থানের আকৃতিটা খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করলে ব্যাঙের মত পাওয়া যায়। ভাগ ভাগ করে ওই জায়গাটার ছবি মিলিয়ে আমি দেখেছি···ব্যাঙ ছাড়া কিছুই নয়, তবে একটা বড় হাতির মত চেহারা।

···ছবিগুলো আমাদের দেখাবেন মামা ? আমি মামাকে প্রশ্ন করলাম।

···হবে হবে অত তাড়া কিসের ? ডক্টর কয়েল সিগারেট ধরালেন। পিজি নিয়ে আমরা এগুচ্ছি হঠাৎ দেখি ক্যাপটেন কেষ্ট বমি করল। আমি অক্সিজেনের টিউব গুলো দেখে নিলাম,···ঠিক আছে। বমি করল কেন ? একটু দুশ্চিন্তায় পড়লাম। ওর দুধের সঙ্গে একটা ট্যাবলেট মিশিয়ে বোতাম টিপলাম···ওর মুখের কাছে দুধ চলে গেল···কিছুটা দুধ ও খেল। হঠাৎ নজর পড়ল ওর চেম্বারের টেম্প্রেচার ভীষণ বেড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ওকে হিট প্রুফ খোলসের মধ্যে নিয়ে এলাম। কি হল কি হল···এত তাপ বাড়ছে কেন ? হিট প্রুফ খোলসের একটা লিমিট আছে। এত গরম বাড়ছে ! ···সম্পূর্ণ আমাদের পিজিটা শেষে গলে যেতে পারে। কি করব কিছু ঠিক করতে না পেরে পিজির ডিরেকশন চেঞ্জ করে দিলাম··· তাতে পিজি ওপর দিকে উঠতে লাগল।···কিছুক্ষণ পর দেখলাম টেম্প্রেচার ধীরে ধীরে কমে আসছে। পিজির ডিরেকশন আর চেঞ্জ করলাম না ওপর দিকেই উঠতে লাগল।

···হঠাৎ টেম্প্রেচার বাড়তে লেগেছিল কেন মামা !

···পৃথিবী সূর্য্যের অংশ। মাটির বহু নীচে কোন কোন স্থান এখনও ভীষণ উত্তপ্ত,···আমরা সেই রকম একটা অঞ্চলে গিয়ে

পড়েছিলাম।

…আপনি যদি ডিরেক্শন না চেঞ্জ করতেন তাহলে কী হত মামা?

…আমরা আগুনের কুণ্ডে গিয়ে পড়ে গলে ধাতুর সঙ্গে মিশে এটম হয়ে যেতাম…শুধু কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। কিন্তু সে বিপদ কাটিয়ে আবার আর এক বিপদে পড়ে ছিলাম। বলে, ডক্টর কয়াল সিগারেটে টান দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

আমরা অধৈর্য্য হয়ে পড়ছি, ডক্টর 'কে' কে প্রশ্ন করতে পারছি না ধমক খাওয়ার ভয়ে। শেষে আমি সাহস করে বলে উঠলাম। বিপদটা মামুলি ধরনের ছিল নিশ্চয়।

…মামুলি ধরনের! মাটির নীচে কবর হবার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। আমরা মিশরের কোন ফারাও এর প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিলাম বেরিয়ে আসার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

—প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিলেন?

—হ্যাঁ আজ থেকে বহু বহু বছর আগে কত ফারাও যে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করে গেছে…মানুষের বিচার করে গেছে, সামান্য আঙুল হেলিয়ে কত মানুষের উত্থান পতন ঘটিয়েছে, মাটির নীচে তাদেরই সিংহাসনের কাছে আমি পৌঁছে ছিলাম।

—সিংহাসনটা কি বোঝা গিয়েছিল।

…কি করে এক নৈসর্গিক উপায়ে ভেতরে জল প্রবেশ করেছিল। বহুদিনকার বদ্ধ জল। মাটির নীচের জল তাই দূষিত নয়। জল থাকার জন্যই আমরা বেঁচে ফিরতে পেরেছি এবং ভাল ভাবে পরীক্ষা করতে পেরেছি। সব জায়গায় অবশ্য জল ছিল না। যে যে জায়গায় জল ছিল সেগুলো রিফ্লেক্টিং সার্চ লাইট ফেলে ফেলে দেখে এসেছি।

—কি কি দেখলেন মামা?

—রিফ্লেকটিং লাইট ফেলে দেখছিলাম কোন পথে বেরোনো যায়।

যেখান দিয়েই চেষ্টা করছি পিজি ছাদে গিয়ে আঁটকাচ্ছে। আশ্চর্য আশ্চর্য আর্কিট্যাকট। প্রায় তিনশ' গজ এক জায়গায় উঠে গিয়েছি তবু দেখলাম সেখানে ছাদ। আমার মনে হয়েছিল এইবার বুঝি আমরা বেরিয়ে যাব কিন্তু তবু পিজি তিন শো গজ ওপরে গিয়ে আটকে গেল। সেই সময়টায় বড় ভয় হয়েছিল। এই গোলক ধাঁধা থেকে কি জীবনে বের হতে পারব না!—না এখানেই আমাদের চিরতরে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। ক্যাপটেন কেষ্ট যেন বুঝতে পারল। ও বাইরের দিক্ নির্ণয় করে ডিরেকশন বদলাচ্ছিল বটে কিন্তু বার আমরা হতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা বিরাট বড় ঘরে পিজি ঢুকে পড়েছিল—সেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত পাথরের স্ট্যাচু। কি বলব তোমাদের অর্ধেক মানুষের অর্ধেক ঘোড়ার। উড়ন্ত পরী।—একটা বিরাট বড় বৃষ। বৃষটা বাইরে ছিল মনে হয়। এত বড় যে একশো টন ওজন হবে। একটা সিংহাসন রাখা ছিল সেটা দুটো খাটের সমান। সেদিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল ফারাও যেন বসে আছেন পাশে রাণী। সামনে অস্ত্র সজ্জিত রক্ষী বাহিনী আর বিচারের আশায় জনগণ ফারাও এর জয়ধ্বনি করে সামনে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে। এই যেন সেদিনের ব্যাপার। যেদিন ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে এক বিদেশী সওদাগর, মুসাফির হয়ে রাজদরবারে প্রবেশের আশায় দরবারের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। রক্ষীবাহিনী তাকে ফটকের কাছে আঁটকে দিয়েছিল। বালুর ঝড় খাওয়া মুসাফির দীর্ঘ সময় ফাটকের বাইরে বসেছিল রাজদর্শনের আশায় এবং সফলও হয়েছিল। এ সব আমার মনে কি করে যে সেদিন অত বিপদের মধ্যে এসেছিল তা তোমরা বুঝতে পারবে না। কারণ পিজি নির্ভুল তৈরী হয়েছে সেই আনন্দে আমার মনে রোমান্টিকতা এসেছিল। আমি পিজির সঙ্গে অত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যদি না যেতাম তাহলে পিজিকে আরও নির্ভুল তৈরী করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হত না। শুধু যদি ক্যাপটেন কেষ্টকে পাঠিয়ে ক্ষান্ত হতাম তাহলে পৃথিবীর

ইতিহাসে এ পরিবর্তন ঘটত না। সামান্য একটা লোকের দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে যায়, যদি সমগ্র জনসাধারণ সেই ইচ্ছাকে বহন করে। যেমন সেদিন সেই মুসারিরের সাক্ষাৎ মিশরের ইতিহাসে…যাক সে কথা…।

কতগুলো কাক মাথার ওপর দিয়ে শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। আরও অন্ধকার এইবার নামবে।

ডক্‌টর কয়াল বললেন, এইবার ওরা বাড়ি ফিরছে। আমরা সেদিন বাড়ি ফিরতে পেরেছিলাম। আমরা ওপরে উঠে এসেছিলাম।

কি করে বেরুলেন মামা? পথ পেয়েছিলেন?

—বের করে এনেছিল ক্যাপটেন কেষ্ট। ও হঠাৎ পিজি ঘুরিয়ে আবার নীচের দিকে নামিয়ে দিল--নীচে মাটি। পিজি চলতে লাগল। কিছুদুর নামার পর পিজিকে ভার্টিক্যাল না তুলে হরিজেণ্ট্যাল ডিরেক্‌শনে মাইল দশেক চালিয়ে দিল। তারপর ভার্টিক্যাল ডিরেক্‌শন করে চালাতে লাগল। আর কোন শক্ত কিছু পথে পড়ে নি। মাটির নীচে দেখলাম বেড়ালের ইণ্টেলিজেন্‌স মানুষের কাছাকাছি হয়ে যায়।

—আপনারা কোথায় উঠেছিলেন?

—পিজি নিয়ে আমরা মাটির ওপর কোথায় উঠেছিলাম সে খবর আজ পর্যন্ত কেউ জানে না—ওটা টপ সিক্রেট। মিশরের মাটির নীচে অন্ধকার নগরী একদিন আমার ইংগিতে মাটির ওপর উঠে আসবে। সভ্যতার বিকাশের সূত্রপাতে মিশরের সভ্যতার উৎকর্ষ ছবি হয়ে উঠবে। পৃথিবীর সব বিজ্ঞানী জানতে চায় পিজি নিয়ে ডক্‌টর কে কোথায় উঠেছিলেন।—হাওয়া বইছে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ মামা একটু হাওয়া উঠেছে।

ডক্‌টর কয়াল দূরে তাকিয়ে রইলেন। ঝড় উঠছে!

—না ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে না।

—কি বলছ হারুণ ঝড় উঠবে না? আমি বুঝতে পারছি ঝড়

আসছে। সাইবেরিয়ায় সেদিন ঠিক এই রকম প্রথমটা ধীরে ধীরে হাওয়া উঠেছিল তারপর প্রচণ্ড ঝড়। তোমরা এবার চলে যাও আর আজ নয়। আমি অপেক্ষা করব সেদিনের মত ঝড় উঠে কিনা দেখব।

—অন্ধকার হয়ে আসছে আপনি একা এই মাঠে থাকবেন ?

—ঝড়ের প্রকৃতিটা যদি সেদিনের মত হয়। হাওয়াটা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে না ?

—না তেমন কিছু নয়।

—আমি এইবার উঠে মাঠের পূর্বদিকে চলে যাব, আমার এই মাঠে কিছু দেখবার আছে। তোমরা এইখানে বসে থাকতে পার আমি র‍্যামপার্টের দিকে দেড় ঘণ্টা বাদে গিয়ে দাঁড়াবো। ওখানে একটা টর্চ জ্বালব, তার কি রিএকশ্যান হয় দেখতে চাই। ডকটর কয়াল উঠে দাঁড়ালেন।—আমি চলি।

ডক্‌টর কয়াল চলে গেলেন। আমরা বসে বসে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলাম, তারপর ওঁকে আর দেখতে পেলাম না।

ঘণ্টা দেড়েক এক স্থানে বসে থাকার ধৈর্য্য আমাদের ছিল না। এদিক সেদিক ঘুরে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এসে আবার ওই জায়গাটায় বসলাম। বেশ অন্ধকার। ঝড় আসে নি। যে হাওয়াটা উঠেছিল সেটা আর নেই। একটা পুলিশ এসে বলল আপনারা এখানে বসে থাকবেন না, চলে যান। কুচিল মামার সঙ্গে দেখা হল না। ওঁর টর্চের আলো দেখবার সুযোগ হল না। আমাকে আর নিমাইকে সেদিন মাঠ ছেড়ে চলে আসতে হল।

বিজ্ঞানের কুহক

আবার একদিন ডাক্তার কের সঙ্গে আমাদের দেখা। বড়দিনের সময় আমি আর নিমাই চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলাম সেখানেই ডক্টর কের সঙ্গে দেখা। বর্মাদেশীয় একটা বাঁদরকে ডক্টর কে বাদাম ছাড়িয়ে খাওয়াচ্ছিলেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি সব নিরীক্ষণ করছিলেন। আমরা ডক্টর কের সঙ্গে একটা রেষ্টুরেন্টে বসে চা আর সিঙ্গাড়া খেলাম। অনেক ঘোরাঘুরি করে আমাদের পা ধরে গিয়েছিল তাই ডক্টর কে যখন বললেন চল একটু চা খাই আমরা আর আপত্তি করলাম না। ডক্টর কে একটা নোট বই বার করে কী সব লিখতে লাগলেন। আড় চোখে দেখলাম, যে বাঁদরটা দেখে এলেন, ওপরের লাইনে সেটার নাম লেখা আছে—'বর্মা দেশীয় লম্বা লেজের বাঁদর'। বুঝলাম বিভিন্ন পশু-পাখির বিষয় উনি কিছু নোট নিচ্ছেন। আমি বললাম, মামা সিঙ্গাড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ডক্টর কয়েল একটা সিঙ্গাড়া তুলে কামড় দিয়ে আবার নোট বুকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই রকম কিছুক্ষণ চলার পর হাত লেগে ডকটর কয়ালের চায়ের কাপ উল্টে গেল। আমি তাড়াতাড়ি সরে গেলাম। নিমাই ছোঁ মেরে ডকটর কয়ালের নোট বুকটা সরিয়ে দিল। সামান্য চা ছলকে ওটার ওপর পড়েছিল, রুমাল বার করে মুছে দিল। ডক্টর কয়াল একটু উঁচু গলায় বলে উঠলেন আর এক কাপ চা দাও।—কম করে নাইনটি ডিগ্রি তাপ হওয়া চাই। বুঝলে, চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল পড়ে গিয়ে ভালই হয়েছে। সিঙ্গাড়া, ব্যাটারা মনে হয় ফ্রিজ থেকে বের করে দিচ্ছে, এত ঠাণ্ডা হল কি করে। ডক্টর কয়াল একটা সিঙ্গাড়া তুলে কামড় দিয়ে কথাগুলো বললেন।

নিমাই বলল, না মামা আপনি অনেকক্ষন খান নি তাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আমরা যখন খেলাম কিছু গরম ছিল। আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে আপনি স্টাডি নিয়ে ব্যস্ত।

আমি আর নিমাই চুপচাপ বসেছিলাম তাই মামাকে নিমাই হয়ত বলল।

ডক্‌টর কে ঘড়ি দেখলেন, দেরী হয়েছে একটু। চা-টা খেয়ে আমি উঠব। কিছুক্ষণ পরেই চিড়িয়াখানা বন্ধ হয়ে যাবে। চল এক সঙ্গে বেরুন যাক। তোমাদের কোন কাজ নেই ত' ?

আমরা দুজনেই বললাম, না আমরা আপনার সঙ্গেই বেরুব। সেদিন সাইবেরিয়া আর পাতাল সফরের কথা শুনেছিলাম, তারপর আর দেখা নেই মামার সঙ্গে তাই নতুন কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্বন্ধে জানতে আমরা দুজনেই উৎসুক। সেই কারণে আমি আর নিমাই পেছু পেছু চিড়িয়াখানা থেকে বেরুলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বাস গুলোয় ভীষণ ভীড়। পদানীতে পা রাখবার জায়গা নেই। হাঁটতে হাঁটতে আমরা খিদিরপুর পুল পেরিয়ে হেস্টিংস পেরিয়ে অনেকটা হেঁটে এলাম। রেস কোর্সের মাঠে হাল্কা ধোঁয়ার গায়ে সন্ধ্যা এলিয়ে পড়েছে। আমরা একটা জায়গায় বসলাম। মামা বললেন এক সময় বাস খালি হবে তখন ধর্মতলা গিয়ে যে যার জায়গায় চলে যাবে। তোমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে না ত? সত্যি কথা বলতে কি দেরী আমাদের হচ্ছিল। মা বলে দিয়েছেন চিড়িয়াখানা থেকে সোজা বাড়ি চলে আসবে। নিমাই মামার বাড়ি থাকে, ওর কড়াকড়ি বেশী তবে চিন্তা করবার মা নেই এই যা।

আমি বললাম দেরী হোক মামা, মাকে বলব আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাই দেরী হল।

ডক্‌টর কয়াল মাফলার টেনে মাথায় বাঁধলেন। বললেন, কানটা ঢেকে বস ঠাণ্ডা লাগবে। বেশ শীত পড়েছে দেখছি। ঘুরে ফিরে আমি সেই সাইবেরিয়ার কথা তুললাম। সাইবেরিয়ার ঠাণ্ডার

কাছে এ ঠাণ্ডা কিছুই নয়।

ডক্‌টর 'কে' কোন কথা বললেন না চুপ করে রইলেন। কি যেন ভাবছেন। কিছুক্ষণ পর নিজের মনেই বললেন, বাঁদর অনেক সময় মানুষের যা অসাধ্য তাই করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নিমাই প্রশ্ন করল, তাই নাকি মামা ?

—কিছুই জান না। বাঁদর মিলিট্যারীর মধ্যে আছে এবং যুদ্ধের সময় আর্মিকে সাহায্য করে। জঙ্গল যুদ্ধে ওরা হেল্পফুল।

—শুনেছি কাশীতে একবার বাঁদর ছেলে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তারপর কলা আম এই সব ফল টল দিতে ফেরৎ দিয়ে গেল। বলে, নিমাই মামার দিকে তাকাল।

—ডক্‌টর কে বললেন, ঠিক কথা। আমি কাশীতে ছিলাম, জানি ওদের অনেক রকম কাণ্ডকারখানা। শিশুকে তুলে নিয়ে যাবে কিন্তু অক্ষত অবস্থায় রাখবে। কেউ পেছনে লাগলে তাকে আবার উচিৎ শিক্ষাও দিয়ে দেবে। আমায় একটা বাঁদর একবার ভাবিয়ে তুলেছিল।

—কি মামা ?

—আমি একটা বাঁদর পেয়েছিলাম, সে সোনা পাচার করত।

—সোনা পাচার করত ? ...মানে! স্মাগ্‌লার ?

...হ্যাঁ সেছিল ইণ্টারন্যাশানাল স্মাগলার দলের সঙ্গে। ডক্‌টর কয়াল একটা সিগারেট ধরালেন। বার্মা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যে সোনা পাচার হত সেটা ওই বাঁদরের থ্রু তেই হত।

—ভারি আশ্চর্য ত' ?

—হ্যাঁ। বাঁদরটার নাম ছিল—'তোড়া'। বেশ তোয়াজে রাখা হত বাঁদরটাকে, রোজ সকাল বেলা উঠে ও পেস্তা বাদামের এক গেলাস সরবৎ খেত, তারপর আট্টার সময় দু স্লাইজ মোটা মাখন মাখান রুটি আর দুটো গাছ পাকা মর্তমান কলা।

—বাবা সাংঘাতিক তোয়াজ ছিল তোড়ার। আমি হেসে

বললাম। ডক্‌টর কয়াল খুব ধীরে ধীরে সিগারেট টানছিলেন হঠাৎ একটা টান জোরে দিয়ে বললেন, তা থাকবে না? যেদিন ও হুক্‌আপ করত সেদিন প্রায় দু কেজি সোনা পাচার করত গড়ে।

—হুক্‌আপ কি মামা?

—হুক্‌ আপ মানে একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের লিংক করে দেওয়া। স্মাগলিঙে ত' লিংক আর স্বাভাবিক পথে হয় না।

—আর কী খেত তোড়া? —মামা! আমি প্রশ্ন করলাম।

—সে কথাই ত' বলছিলাম মাঝখানে নিতাই যে হুক্‌আপ কী জিজ্ঞেস করল। ডক্‌টর কে সিগারেট ফেলে দিয়ে আবার একটা ধরালেন। —হ্যাঁ আমি কী বলছিলাম?

—তোড়া কী খায়।

—হ্যাঁ। সকাল দশটার সময় কড়াই ভেজা কিংবা সোনা-মুগের ডাল, অঙ্কুর বেরুন অবস্থায় দেওয়া হত। খুব ভালো কাব্‌লি ছোলা অঙ্কুর বের করাও চলত তার সঙ্গে গোঁণ্ডার আখের দানা গুড়।

—গোঁণ্ডার আখের গুড় কী মামা? নিমাই প্রশ্ন করল।

—ইউ, পি'তে লখনৌর কাছে গোঁণ্ডা বলে স্থানের গুড় খুব ভাল হয়।

—ওঃ তাই বুঝি?

—আমার তাই মনে হয় বাঁদরটাকে ইউ, পি থেকে সংগ্রহ করেছিল। বার্মার বাঁদরের খাবার এই ধরনের হতে পারে না। অবশ্য লাঞ্চটা তোড়া খুব বেশী খেত না

···লাঞ্চ কি করত মামা? নিমাই জিগ্যেস করল।

···ওই লোকটা কি বিক্রি করছে দেখত? গরম চা হলে বলিস। একটু চা হলে ভাল হয়। শীতে একটু আরাম লাগে। হ্যাঁ যা বলছিলাম···কী বলছিলাম?

...তোড়া লাঞ্চ বেশী করে না।

...ঠিক বলেছ। বারটা থেকে একটার মধ্যে তোড়া লাঞ্চ করত। চার স্লাইজ পাঁউরুটি মাখন দেওয়া। তিনটে কলা, তাছাড়া সিজিনের যে ফল পাওয়া যায়। আমের সময় আম কিংবা আপেল। এক বোতল বিয়ার, সোয়া-বিন সেদ্ধ এক প্লেট। এবং পাকা পেয়ারা কিংবা দার্জিলিঙের কমলালেবু দিয়ে ফ্রুট স্যালাড ফ্রিজে ঠাণ্ডা করা।

—এর নাম লাঞ্চ কম করা? বাঃ বা! আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

নিমাই বলল, তোড়া সম্পর্কে আপনি এত কোথা থেকে ক্যালেক্ট করলেন মামা?

....হাঃ হাঃ হাঃ। ডক্টর 'কে' অফ ইণ্ডিয়া পারে না কি? আজ যে চিড়িয়াখানায় এলাম সেটা কি সখ করে না আমি তোদের মত ছেলেমানুষ? এর মধ্যে আমি বাঁদর আর নেংটি ইঁদুর নিয়ে রিসার্চ আরম্ভ করেছি...কারণ এরা আমার ভীষণ ভুগিয়েছে। দু দুবার।

...আপনাকে?

...হ্যাঁ আমাকে। ডক্টর 'কে' কে। তবে একটু চা খেলে গলাটা ভিজত। ডক্টর কয়াল চারদিকে তাকালেন।

...বট গাছটার নীচে একটা চায়ের দোকান রয়েছে। আমি বললাম, যা নিমাই বলে আয় চা দিয়ে যেতে...দিয়ে কি যাবে? অনেকটা দূর! ...আমরা নিয়ে আসি মামা?

...যাও তোমরা খেয়ে এস আর নিয়ে এস।

আমরা চা খেয়ে চা নিয়ে এলাম। নাইনটি ডিগ্রি টেম্প্রেচার রইল না নিশ্চয়। ডকটর কয়াল বসে বসে চশমা মুছিলেন। ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন কোথা থেকে মনে হল এক ফোঁটা জল পড়ল। মেঘ নেই...যত সব....।

—নিন মামা চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। —কোন বক টক উড়ে

যাচ্ছিল গা থেকে জল পড়েছে হয়ত। আমি বললাম।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ডক্‌টর কয়াল বললেন, হয়ত বলে সাইন্সে কোন স্কোপ নেই—ডেফিনিট করে বলতে হবে। বক—? বক—বকের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা ভাল লেখা আছে—।

মামা তোড়ার কি হল?

মামা অন্য প্রসঙ্গে চলে না যান সেই জন্যে আমি তোড়ার কথা তুললাম।

হ্যাঁ তোড়া। সেই কথাই বলব। বলে ডক্‌টর কয়াল চা টা খেয়ে ফেললেন। আজ চিড়িয়াখানায় বর্মার বাঁদর নিরীক্ষণ করে মনে হল ভারতীয় বাঁদর দলবদ্ধ হয়ে বাস করা ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে এবং ভারতীয় বাঁদর দিয়েই যত সব অপকর্ম্ম করানো যায়। সেই কারণে ইণ্টারন্যাশানাল স্মাগ্‌লিঙে ভারতীয় বাঁদর ব্যবহার করা হয়েছিল। ···মাদারী জান?

···না মামা।

···মাদারী মানে যারা খেলা দেখায়। বাঁদর নাচ দেখায়। মাদারীর হাতে বাঁদরের গলার দড়ি থাকলে যেমন খুশি নাচানো যায়। মাদারী যেমনটি চাইবে বাঁদর তেমনি নাচবে। কিন্তু বার্মার বাঁদরকে তেমন করা যাবে না···ভারতীয় হনুমানদের ও তেমন করা যাবে না।···সেই কারণে রামচন্দ্র হনুমান ফোর্স না করে বাঁদর সেনা তৈরী করেছিলেন। ডক্‌টর কয়াল সিগারেট ধরালেন।

আমি মামাকে নম্র ভাবে প্রতিবাদ করলাম, ভারতীয় বাঁদরের বুদ্ধি বেশী সেই জন্যে ওরা কাজে আসে।

—কার কাজে আসে? মাদারীর?—স্মাগলিং করাটা কাজ? এক দেশের সম্পদ অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া কাজ? জোরে সিগারেটে টান দিয়ে মামা চুপ করে রইলেন।

—যুদ্ধের সময় কাজে আসাটা কাজ নয়? নিমাই জিগ্যেস করল।

—নিশ্চয় কাজ সেটা যদি সমগ্র দেশের মানুষের জন্যে হয়।

আমি নিমাইকে ইশারা করলাম চুপ করতে।

ডক্টর কয়াল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন একমুখ। ধোঁয়াটা কুণ্ডলি পাকিয়ে খুব ধীরে ধীরে ছাড়তে লাগল। শীতের ভারি হাওয়ায় ধোঁয়া ওপরে ওঠার পথ হারিয়ে ফেলছিল। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে শেষে ডক্টর কয়াল বললেন, শেষে বাছা-ধনেরা ডক্টর কে'র স্মরণাপন্ন হল। হতেই হবে, একি তোদের ল্যাণ্ড কাসটম্স্ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে'র কাজ, তাছাড়া ইণ্টার ন্যাশনাল স্মাগলার রা তোদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী শক্তিশালী এবং অর্গানাইজড। নিমাই কিছু জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল। আমি ওকে চিম্‌টি কাটলাম। ডক্‌টর কে'র মুড এসেছে এখন কিছু প্রশ্ন করিস না। ফিস্‌ফিস্ করে বলে বারুন করলাম।

···হ্যাঁ অর্গানাইজড না হলে ওরা কাজ চালিয়ে যায় কি করে। আসলে সবাই ডুবে ডুবে জল খায় শিবের বাবাও টের পায় না। বার্মা বর্ডারে তোড়ার মত আর একটা বাঁদর ছিল সেটার নাম ছিল আলা মোহন। আমি দেখিনি শুনেছি সেটা রামেশ্বরের বাঁদর। তবে সেটা নাকি এত এক্‌সপার্ট ছিল না সেই জন্যে গুলি খেয়ে মারা যায়। সেটা মরতেই বাছাধনেরা টের পেল বাঁদর দিয়ে সোনা পাচার করা হয়। তারপর তোঁড়ার কথা জানতে পেল কিন্তু তোড়াকে কোন দিন চোখে দেখতে পায় নি কেউ। সিল্‌ড বর্ডার দিয়ে কোটি কোটি টাকার সোনা চলে আসছে কী করে, সকলের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। তখন আমার কাছে সব এলেন সব মাথা অয়লা বিজ্ঞানীরা।

···আপনি ওদের আপ্যায়ন করেছিলেন মামা ?

···হ্যাঁ বিজ্ঞানীদের বেগুনি আর মুড়ি খাইয়েছিলাম, তার সঙ্গে এক কাপ করে ছাগলের দুধের চা।

তারপর কি হল মামা ?

—৩

আমি বর্ডারে গেলাম। পাকিস্তান আমায় খাতির করল, খানা খাওয়ালো। সরকারী লেবেলে লোক জড়িত ছিল এই ব্যাপারে তাই আমি আর বেশী ঘাঁটালাম না। সব কিছু শুনে কয়েকদিনের জন্যে একটা ছোট ল্যাবোটরী সেট্ করলাম এবং বললাম আমায় গোটা কয়েক বাঁদর এনে দাও। ডক্টর কয়াল সিগারেটের শেষাংশ ফেলে দিলেন।—গোটা দশেক বাঁদর এনে দিল।

···কোথাকার বাঁদর মামা? আমি প্রশ্ন করলাম। ক্ ক্ করতে করতে কতগুলো কাক মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

—ওখানকারই হবে আমি ঠিক করে দেখিনি, আমার দেখার ছিল অন্য ব্যাপার। আর এ দু জায়গার বাঁদরে বিশেষ তফাৎ নেই। আমি দেখছিলাম, বাঁদরের লোমে কী ধরণের ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপন্ন হয়, ওই যে statical Electricity.—তোমরা পড়েছ ত'। সেটাই। ডক্টর কয়াল প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করলেন। বাঁদরের গায়ে যে চার্জ উৎপন্ন হয় তার বিপরীত চার্জ যদি বাঁদরের কাছাকাছি পাঠানো যায় তাহলে ডিস্‌চার্জ হবে সেটা থেকে সিগন্যাল আসবে, সেটা এবং আরও কয়েকটা ব্যাপার আমার দেখার ছিল। এরা মানে এখানকার বিজ্ঞানীরা শুধু মেটাল ডিটেক্‌ট্যার দিয়ে ধরতে চেয়েছিল।

—আপনি কি করেছিলেন মামা?

—আমার সত্ব ছিল তোড়াকে ধরে আমাকে দিতে হবে। ওরা রাজি হয়েছিল কিন্তু কোন লিখিত দলিল করা হয়নি। আমি আমার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করে একটা জিপ গাড়িতে ক্লাউড চেম্বার সেট করে চার্জ ওয়েভ যাতে চারিদিকে পাঠাতে পারি সে সমস্ত ব্যবস্থা করে জিপ গাড়িটাকে বর্ডার অঞ্চলে পেট্রোলিং এর জন্যে বলে দিলাম এবং ওদের বুঝিয়ে দিলাম—সিগনাল এলেই তার দূরত্ব এবং ডিরেকশন মিটারে শো করবে, সেই মত জিপ চালিয়ে বাঁদরটার কাছে গিয়ে ধরতে হবে। জ্যান্ত ধরা চাই।

—জ্যান্ত কী করে ধরবে মামা ?

—সেটা তাদের ওপর ভার দিয়েছিলাম। ট্র্যাংকুলাইজার গুলি চালালে অজ্ঞান হয়ে যাবে তারপর ধরতে পারে। অবশ্য আমি বলেছিলাম জাল দিয়ে বা অন্য উপায়ে ধরতে। চিড়িয়াখানায় জন্তু জানোয়ার এত ধরে কী করে ? সামান্য বাঁদর ধরতে মতলব বলতে হবে। ডকটর কের সিগারেট নিভে গেছে। কথা বলতে গিয়ে ঠিকমত টান দিতে পারেন নি। বিরক্ত হলেন। —তামাকগুলো ভেজাল।

—তারপর কী হল মামা ?

—হল আর কী, সর্ব্বনাশ হল। ইঃ আর মোটে চারটে কাঠি আছে। এস আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাক। বট গাছটার নীচে সিগারেট বিক্রি করছে ?

—হ্যাঁ মামা। চলুন।

আমরা বট গাছের নীচে এলাম। দোকানে খোদ্দের কম হলে কী হবে এক আধ জন করে মাঝে মাঝে আসে।

আর এক ভাঁড় করে আমরা তিন জনে চা খেলাম। ডক্‌টর কয়াল এক প্যাকেট সিগারেট ,আর দেশলাই কিনলেন। তারপর আমরা চলে এলাম এবং মাঠের ট্রাম লাইনের ধারে একটা উঁচু জায়গায় বসলাম। ডক্‌টর কয়াল মিনিট দশেক মুখ খুললেন না। কী সর্বনাশ হয়েছিল আমরা অনুমান করে উঠতে পারছিলাম না। দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যে না বাঁদর ঘটিত অন্য কোন ব্যাপারে…।

একটা ট্রাম চলে গেল। মনে হল লাইন ছাড়াই মাঠের ওপর দিয়ে একটা আলোর ঘর ছুটে গেল। ট্রামে লোক ভর্ত্তি, কারণ ট্রামের দরজা দিয়ে আলো পড়তে দেখলাম না।

ডক্‌টর কয়াল দেশলাই থেকে কাঠি বার করে কান চুলকে নিলেন। ননসেন্স। ইডিয়েট গুলো অপদার্থ—'এ্যান্টি ম্যাটার।'

ডক্‌টর 'কে' কাকে কি বললেন বুঝলাম না। আমি নিমাইয়ের দিকে তাকালাম নিমাই আমার দিকে তাকাল।

হঠাৎ আমি নিজের মনে বললাম—তোড়া।

—তোড়াকে ওরা মেরে ফেলেছিল। ডক্‌টর কয়াল বললেন



…তোড়া এত ফাস্‌ট যে আমরা…

—আমি বলেছিলাম তোড়াকে আমার হাতে দিতে তা দেয় নি। একটা আজগুবি গল্প ফেঁদে বলল তোড়া এত ফাষ্ট যে আমরা কিছুতেই ওর নাগাল পাচ্ছিলুম না তাই গুলি করতে হল।

—গুলি করল? ট্রাকুই-লাইজার বুলেট সর্ট করলেই ত' হত। নিমাই বলল।

ডক্‌টর কয়াল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। —হত ত'। তাহলে সোনা স্মাগ্‌লিঙে কারা কারা আছে আমি ধরে ফেলতাম যে। সেই কারণে ওরা তোড়াকে মেরে ফেলল। 'থাণ্ডার ডিটেক্‌টর'-দিয়ে আমি ওকে লোকেট করার ব্যবস্থা করে ভুল করে ছিলাম।

—আপনি বিজ্ঞানী হিসেবে আপনার কাজ করেছেন তারা তাদের কাজ করেছে। —সোনা কতটা পেয়েছিল তোড়ার কাছে?

—হু কেজি। ডক্‌টর কয়াল গম্ভীর স্বরে বললেন।

—এতটা সোনা পাচার করত এক সঙ্গে !

—হ্যাঁ ওর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ডক্‌টর কয়াল বললেন।

প্রথমে ওরা বলেছিল আপনার ক্লাউডের চার্জ লেগে ও মারা গেছে, পরে যখন আমি দেখতে চেয়েছিলাম তখন বলল ওকে গুলি করা হয়েছিল।

—বাঁদরের এত অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে মামা ?

ডক্‌টর কয়াল বললেন, বাঁদর ত' বুদ্ধিমান জন্তু। ইঁদুরের ক্ষমতা শুনলেই অবাক হবে।

—ইঁদুর ?

—হ্যাঁ ইঁদুর ! ক্যানাডার একটা ব্যাপারে একবার আমাকে মাথা ঘামাতে হয়েছিল। ডক্‌টর কয়াল সিগারেট ধরালেন।

—কানাডা মামা ?

—হ্যাঁ মন্ট্রিল থেকে গেলাম একটা গ্রামে। গ্রাম মানে আমা-দের মত গ্রাম নয় : —সে গরুর গাড়িও নেই, মাঠে গরু চরাও নেই। —চলতে গেলে দর্বাদল দলতে হয় না—আর পুকুরে মরাল মরালীর পেছন পেছন ছুটে সময় নষ্ট না করে। —সব পাকা সড়ক আর বিজলী বাতি-কলের জল। গ্রাম খানা উইনিপেগ হ্রদের কাছে। হাজার হাজার একর নিয়ে গমের চাষ।

গম গাছ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কাঁচা গাছে গম ঝুলছে যেন আগামী দিনের সবুজ আলোর সংকেত বহন করে আছে। সেয়ারম্যান হল ওই ফার্মের ম্যানেজার, বলল, সত্যি ডক্‌টর কে খামার দেখলে চোখ জুড়োয় কিন্তু কিছুদিন পর আমরা চোখের জল ফেলব।

—কেন ?

—গম যখন পাকবে তখন হাজার হাজার ইঁদুর এসে গমের ডগা কেটে কেটে নিয়ে কোথায় চলে যাবে আমরা হদিস করতে পারব

না। আমরা ইঁদুরের গর্ত্ত খুঁড়ে খুঁড়ে বহুদূর পর্যন্ত গিয়েছি তাতে আমাদের কোন লাভ ই হয় নি। ইঁদুর মাটির নিচ দিয়ে কোন-পাহাড়ের গুহায় গিয়ে গম জমা করে। এ রকম একটা গুহা আমরা উদ্ধার করেছিলাম। কিন্তু তার পরের বছর সে গুহায় আর ওরা গম জমায় নি অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। এই রকম খুঁজে খুঁজে গম উদ্ধার করতে যা খরচ হয় তাতে আমাদের গমের দাম ভীষণ বেড়ে যায় এবং লসে বিক্রি করতে হয়।

সেয়ারম্যানের কাছে ডিটেল ষ্টেটমেণ্ট নিলাম। নিয়ে বললাম, আপনাদের আমি সাহায্য করব তবে আমাকে যে ল্যাবোরেটরী দেওয়া হচ্ছে তাতে আরও শ খানেক ইঁদুর চাই।

—আচ্ছা মামা আপনি কি ডিডিটি ব্যবহার করেছিলেন।

—ননসেন্স। ডিডিটি কি ওরা জানে না। হেলিকপ্টার থেকে ডিডিটি এবং আরও কত রকম কেমিক্যালস যাতে মানুষের ক্ষতি না হয় কিন্তু ইঁদুর মরে, ওরা ব্যবহার করতে কি কসুর করেছিল!

—তাতে কি রেজাল্ট ভাল হয় নি?

—ডিডিটি স্প্রে করলে ওরা চলে যেত। ট্রেণ্ড ইঁদুর। অদ্ভুত। ওতে কোনো সুবিধে হয় নি। একটু হেসে ডক্টর কয়াল বললেন! আমি প্রায় তের দিন চেষ্টা করে ওই ক্ষেতের ইঁদুর ধরে-ছিলাম। ব্যাটাদের ধরতে হিমসিম খেতে হয়েছিল।

—আচ্ছা মামা বেড়াল ছেড়ে দিলে ত' ইঁদুররা আসত না। নিমাই বলল।

—সে সমস্ত বুদ্ধি কি ওরা খরচ না করে আমার কাছে এসেছিল আর আমার পেছনে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছিল! গোটা কুড়ি কাবুলী বেড়াল ওরা সাবাড় করেছিল। ডক্টর কয়াল আবার হাসলেন।

—বাবাঃ ইঁদুরগুলোর গায়ে ত' সাংঘাতিক জোর! আমি বললাম।

—ওখানে এক ধরণের যাযাবর কিছু লোক এই ইঁদুর গুলোকে ট্রেনিং দিয়ে গম চুরি করাত-সেটাই ওরা ধরতে পারছিল না। লোক গুলোকেও ধরা সম্ভবপর হয় নি।

—আপনি ধরে দিতে পারেন নি মামা?

—আমি পারব না—ডক্টর 'কে' অফ্ ইণ্ডিয়া? কিন্তু আমার দরকার কী! আমার সঙ্গে যা চুক্তি সেটা হল গিয়ে চুরি বন্ধ করা। ইঁদুরগুলো এসে যাতে গম চুরি করতে না পারে। আমাকে হিম-সিম খাইয়ে দিয়েছিল ইঁদুরগুলো।

—কেন মামা? নিমাই জিগ্যেস করল।

—কেন মামা! তোমরা দেখছি কিছুই জান না! ইঁদুরগুলো কবিরাজী জানে।

—আয়ুর্বেদিয় শাস্ত্র?

হ্যাঁ। আয়ুর্বেদিয় শাস্ত্র কোব্রাজী যাকে বলে। ওদের ওপর যা কিছু ওষুধ প্রয়োগ করি ওরা প্রাকৃতিক ভেষজ খেয়ে সেটার এফেক্ট কাটিয়ে ফেলে। —মহা মুশকিল হয়েছিল।

—তাই নাকি মামা ইঁদুরগুলো লতা পাতা খেয়ে খারাপ প্রতি-ক্রিয়া যদি কাটিয়ে ফেলে-তাহলে ডিডিটির কাজ ইঁদুরের ক্ষেত্রে হবে না। আমি বললাম।

ডকটর কয়াল দেশলায়ের কাঠি বের করেছেন অনেকক্ষণ। সিগারেট আর কাঠি হাতে ধরে বসে রয়েছেন। এইবার সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে কথা বললেন।

—কবিরাজী বিদ্যে বেড়াল কিছু কম জানে না। বেড়ালকে দুব্বো ঘাস খেতে দেখনি?

—ঠিক বলেছেন মামা বেড়ালকে দুব্বোঘাস খেতে আমি দেখেছি।

আমি বললাম, আমিও দেখেছি।

—তাহলেই বোঝ আয়ুর্বেদিয় শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকলে ওরা

হাবজি গুবজি খেয়ে উত্তরোত্তর জীবনী শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছে কি করে!

আমি বললাম তারপর ইঁদুর কি করে তাড়ালেন মামা?

মামা সিগারেট ধরালেন। —সে অনেক কাণ্ড। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলাম প্রকৃতির মধ্যে, ছাড়া অবস্থায় এমন কিছু প্রয়োগ করব যাতে ইঁদুর গুলো কাবু হয়।

—ক্যানো মামা ল্যাবোরেটরীর মধ্যে খাঁচায় বদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করলে কি ফল পাওয়া যাবে না?

—না। যাবে না। তোমাকে ইঁদুর গুলোর অবস্থান দেখতে হবে। তারা আছে-প্রকৃতির মধ্যে, খোলা গম খেতের মধ্যে।

সেখানে কী লতাপাতা খেয়ে তোমার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকে বিফল করে দেবে সেটা বুঝতে হলে ওদের ওপর ছাড়া অবস্থায় পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো উচিৎ।

—ঠিক বলেছেন মামা।

—তোদের মামা বেঠিক কবে বলে? বেহেডদের কথা শুনে তোরা অভ্যস্ত। আমি যা বলি সেটা প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করে সঠিকতা আঁচ করে তবে বলি।

—ঠিক বলেছেন মামা। বেহেডদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। অসংলগ্ন কথা বার্তায় কান পচে গেল। কথায় কাজে জমিন আসমানের ফারাক।

—ওই জমিন আর আসমানের ফারাক করেই ত' ইঁদুর তাড়াতে গিয়ে আমি বিপদে পড়েছিলাম…। বলতে গিয়ে মামার কি যেন মনে পড়ে গেল।

আমরা মামার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই মুহূর্ত্তে যদি কোন প্রশ্ন করি তাহলে মামা চটে যাবেন আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবেন।

সিগারেটের টান গুলো ঘন ঘন দিয়ে মামা আরম্ভ করলেন। —সেয়ারম্যান আমার ল্যাবোরেটরীতে ঢুকে বিপদে পড়েছিল।

—সেয়ার ম্যান কে ?

—আমি নিমাইকে বকে উঠলাম। সেয়ার মান হল ওই ফার্মের ম্যানেজার। একটু আগেই ত' ডক্টর কে বলেছেন।

—ওঃ হ্যাঁ।

—এত ভুলো মন হলে চলে! ডক্টর কে বললেন। হিলিয়াম-এর নাম শুনেছ? নিশ্চয় শুনেছ। গ্যাস হিলিয়াম একেবারেই অকেজো। কিন্তু লিকুইড হিলিয়াম এবং সলিড হিসিয়ামে অনেক অসাধারণ গুণ আছে। একটা বিশেষ তাপের নীচে লিকুইড হিলিয়াম ঘর্ষণ ছাড়াই প্রবাহিত হয়। ওদেরই একমাত্র কোয়াণ্টাম সলিড এবং লিকুইড বলে জানা গেছে।

আমরা বুঝতে পারলাম না।

—হিলিয়াম এ্যাটমের মধ্যে প্রটোন বুলেট দিয়ে বোমবার্ড ঘটিয়ে আমি ইঁদুরের ব্রেনের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম, আমার ঘরে হঠাৎ সেয়ারম্যান ঢুকে পড়বে বুঝতে পারি নি, যত সব ক্যানেডিয়ানদের কাণ্ড। রেডিও এ্যক্টিভ রে ওপর দিকে বেরুছিল আমিও বুঝিনি, তবু আমার মাথায় লেড হেলমেট লাগানো ছিল সাবধানতা হিসেবে।

...তাতে কী হল মামা?

...হল আর কি!' মামা সিগারেটে টান দিলেন। —রে-গুলোকে আমি এমন ভাবে ডাইভার্ট করবার মতলবে ছিলাম যাতে গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে একফুটের মধ্যে থাকে এবং ইঁদুরের ব্রেনে ঢোকে।

—তাতে কি হত মামা?

—কি হত, তার আগে কি হল তাই শোন। —আমি মহা ফাঁপড়ে পড়লাম। সেয়ারম্যানের ব্রেনে রেডিও এ্যকটিভ রে টারগেট করল। ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করার আগে মানুষের ওপর পরীক্ষা হয়ে গেল। দেখলাম সেয়ার ম্যান আবার ঘর থেকে কিছু না বলে চলে গেল। আমি নিজের কাজে মন দিলাম। পরের দিন

সেয়ারম্যানের বৌ, আমি যখন গম খেতে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম কি করে ইন্সট্রুমেন্ট সেট করা যায়, বলল হ্যালো ডক্টর কে আমার স্বামী কাল রাত্রে বলল যাই ডক্টর কের ল্যাবোটরীতে তারপর কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আমায় আর চিনতে পারে না, কিছু বুঝতে পারলাম না।

—এটা কেন হল ডক্‌টর কে ?

—কেন হল !

—আমি মহা দুশ্চিন্তায় পড়লাম। সেয়ার ম্যানের কাণ্ড বিদ্‌ঘুটে হয়ে উঠল। বৌকে বলেছে তুমি আমার মাসি। বৌ তঃ কেঁদে কুল পায় না। ফার্মের মালিককে বলেছে—তুমি আমার মাইনে দাও নি-মাতাল কোথাকার। —এদিকে মালিক সমস্ত খরচ সেয়ারম্যানের হাতেই গচ্ছিত রাখে। বলে ও পয়সা তোমার নয়-সব আমার।

—তারপর কী হল মামা ?

—কি আর হবে ওই এফেক্‌ট আটচল্লিশ ঘণ্টার পর কেটে যাবে আমি জানতাম তাই সেই আটচল্লিশ ঘণ্টার অপেক্ষায় রইলাম কারুকে কিছু বললাম না। ডক্‌টর কে সিগারেটের টুকড়ো ফেলে দিলেন।

—তারপর কী হল ডক্‌টর কে ? আমি আর মামা বলে সম্বোধন করলাম না। কারণ এই সময় ডক্‌টর কে বললে, মামার মুড বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকেই থাকবে।

ডক্‌টর কে বললেন, সেয়ারম্যান আবার নরমাল হয়ে গেল-কেউ এ রহস্য বুঝতেই পারল না। আর আমি বুঝতে দিতেও চাই নি।

—এরকমটা হল কেন মামা ? —বলবেন ?

—ট্রামটা এত খালি কেন ?

—ওটা ডিফেক্‌টিড কার মনে হয় ডক্‌টর কে।

—তাই হবে।

মামা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরম্ভ করলেন। —মানুষের ব্রেনে দুটো ভাগ থাকে। লেফ্‌ট হেমিস্‌ফিয়ার এবং রাইট হেমিস্‌ফিয়ার—দুটোই একই রকম। —মানে বাম গোলার্ধ আর দক্ষিণ-গোলার্ধ। খুব আশ্চর্যের বিষয় এই দুটো গোলার্ধ স্বয়ং সম্পূর্ণ। নিজেরা স্বাধীন ভাবে আলাদা আলাদা কাজ করতে পারে যদি এদের মধ্যেকার সংযোগ নার্ভগুচ্ছ যার নাম Corpus Callosum কে কেটে দেওয়া যায়।

আমি একটু আশ্চর্য হলাম। মামাকে অধৈর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলাম Corpus Callosum কে কি কেউ কেউ কেটে দেখেছে।

—ননসেন্স। আগেই বলেছি ডক্‌টর কে আন্দাজে কোনো কথা বলে না। ক্যালিফোর্নিয়াতে কলেজ অফ মেডিসিনে এসব পরীক্ষা অনেক আগেই হয়ে গেছে আমাকে ওরা পেপার পাঠিয়েছিল।

—তাই নাকি মামা কি ধরণের পরীক্ষা একটু বলুন না? নিমাই আব্দার করল।

—বলছি! তোমরা হলে ময়ান দেওয়া-তোমাদের ব্রেন নিয়ে পরীক্ষা করলে ভাল হয়।

মামা সিগারেট ধরিয়ে আরম্ভ করলেন। ...ওরা এই ধরণের কিছু রুগিকে পরীক্ষা করেছিল যারা নিরোলজিক্যাল পেসেণ্ট। দুটো ব্রেনের সংযোগ আলাদা করা পেসেণ্ট দের নিয়ে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার মধ্যে একটা হল চোখে আলো ফেলে দেখা। —দুটো ব্রেনের গোলার্ধের আলো দেখার ক্ষমতা আছে কিনা পরীক্ষা করা। যখন আলো দৃষ্টির আঁওতার মধ্যে ফেলা হয় তখন পেসেণ্ট বলে-হ্যাঁ আলো দেখলাম। যখন আলো দৃষ্টি ক্ষেত্রের দক্ষিণ কোণে ফেলা হয় তখন পেসেণ্ট বলে-হ্যাঁ আলো জ্বলেছে। দৃষ্টি ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকের সঙ্গে ব্রেণের বাম গোলার্ধের যোগ রয়েছে। শুধু তাই নয় দক্ষিণ হাতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাম গোলার্ধের রয়েছে।

—তারপর মামা…?

—হ্যাঁ। সেই সমস্ত পেসেন্টের দৃষ্টি ক্ষেত্রের বাম কোণে যখন আলো ফেলা হল তারা সকলেই বলল আলো জ্বলে নি, কই কিছু দেখলাম না ত' !

—আমি বললাম তার মানে ?

—নিমাই বলল, বুঝলি না বোকা—মানুষের ব্রেণের দক্ষিণ গোলার্ধের সঙ্গে দৃষ্টি ক্ষেত্রের বাম দিক যুক্ত আছে।

ডকটর কে বললেন, ঠিক বলেছ। দৃষ্টি ক্ষেত্রের বাম দিকের সঙ্গে ব্রেণের দক্ষিণ গোলার্ধে সংযোগ রয়েছে।

নিমাই বলল, মানুষের দক্ষিণ গোলার্ধ অন্ধ আলো দেখতে পায়না।

ডক্টর কে বললেন : নন্‌সেন্স। কথাটা তুমি যা বললে এমন প্রথম প্রথম বৈজ্ঞানিকরাও ভেবেছিল যে মানুষের ব্রেণের দক্ষিণ গোলার্ধ অন্ধ। —কিন্তু আরও পরীক্ষা করা হল। 'দেখা গেল আলো জ্বলেছে একথা দক্ষিণ গোলার্ধ বলতে পারে না কিন্তু ইশারায় বোঝাতে পারে আলো জ্বলেছে।

—তার মানে ?

—তার মানে। বাম দৃষ্টি ক্ষেত্রে আলো জ্বললে দক্ষিণ গোলার্ধ বুঝতে পারে কিন্তু কথায় প্রকাশ করতে পারে না।

—ব্রেণের দক্ষিণ গোলার্ধ কথায় প্রকাশ করতে পারে না ? বুঝলাম না। আমি বলে আবার একটা ননসেন্স শব্দের প্রতিক্ষায় রইলাম।

—কিন্তু মামা ননসেন্স বললেন না।

—বুঝলে না ? দক্ষিণ গোলার্ধে কথা বলার কেন্দ্র নেই। কথা বলার কেন্দ্র হল ব্রেণের বাম গোলার্ধে, তাই বাম গোলার্ধে যা কিছু আসবে সে সেটা কথায় প্রকাশ করে দিতে পারবে কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে এলে পারবে না। এর মানে এই নয় দক্ষিণ গোলার্ধের পরখের ক্ষমতা বামের চেয়ে কম।

আমি চুপ করে মামার কথা শুনতে লাগলাম।

নিমাই বলল, দক্ষিণ গোলার্ধের ক্ষমতা কম নয় কী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয়?

ডক্টর কে বললেন প্রশ্নটা ভাল। পরীক্ষা হল, এমন ব্যবস্থা করা যাতে চোখের আড়ালে বাঁ হাতের কাছে কতগুলো জিনিস রাখা, যার মধ্যে থেকে সে বেছে ধরবে কোনটা তার চোখে পড়ছে। যেমন ধর একটা আঙুর তার বাম দৃষ্টি ক্ষেত্রের ওপর ফেলা হল এবং কতগুলো ফল তার বাঁ হাতের কাছে রাখা হল যে-গুলো সে দেখতে পাচ্ছে না তখন যে ফলে হাত দিয়ে দিয়ে ঠিক আঙুর বেছে বার করবে।

আমি বললাম, তার মানে বুঝতে পারে কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না।

হ্যাঁ। কিন্তু আমি ত' মানুষের স্প্লিট ব্রেণের থিওরি দিয়ে তার প্রয়োগ ইঁদুরের ওপর করতে পারব না যতক্ষণ না আমি ইঁদুরের ব্রেন সম্বন্ধে ধারণা করতে পারছি।

—ইঁদুরের ব্রেন সম্বন্ধে আপনার ধারণা ছিল না মামা? ফট করে নিমাই প্রশ্ন করে উঠল।

—ডক্টর কে অফ্ ইণ্ডিয়া ইঁদুরের ব্রেন জানে না? ইঁদুর বাঁদর বেজি বাগরোল সকলের ব্রেনের ছবি শুধু আমার কাছেই পাবি—ওয়ার্লডে আর কেউ নেই তোদের মামা ছাড়া। তবে ইঁদুরের ব্রেণ ক্যানাডায় বসে স্টাডি করতে গিয়ে আমার একটু সময় বেশী লেগেছিল। যদিও সেয়ারম্যানের ওপর ওই এফেক্টে সাপেবর হয়েছিল। কাজ হয়েছিল। সাপে বর হয়েছিল কেন মামা?

—মানুষেব ব্রেণের সঙ্গে ইঁদুরের ব্রেণের অনেক মিল আছে। বলে ডক্টর কে সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। আবার আরম্ভ করলেন। তোমরা আবার প্রশ্ন কর। বুঝতে পার নি? ইঁদুর পরের ভাল দেখতে পারে না,

তোমাদের শ্রেণীর মানুষও পারে না।

—কেন মামা ?

—একটা সুন্দর সাজানো গোছানো সেলফের কাগজ পত্তর বা বই ইঁদুর দাঁতে কেটে তছনছ করে দেয়, আটার বস্তা কাটছে চালের টিন ফুটো করছে-কি না করছে··· ।

—মানুষে কি করে ? মানুষ ত' আর দাঁতে কাটতে পারে না।

—না তা পারে না। তবে তারা কলম দিয়ে কাটে। কথা দিয়ে কাটে। ইঁদুর গর্ত্ত খোঁড়ে, মানুষও গর্ত্ত খোঁড়ে।

—মানুষ গর্ত্ত খোঁড়ে ?

হ্যাঁ আইনের গর্ত্ত। তা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

আমি হাসলাম।

—আর হাসতে হবে না। মানুষ গর্ত্তে ঢোকে জান !

অঁা ?

হ্যাঁ তাড়া পেলে ইদুর গর্ত্তে ঢোকে, আর মানুষের গর্ত্ত হল ঘর। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তাহলে বলতে চাও মানুষের সঙ্গে ইঁদুরের মিল নেই ?

—ভীষণ মিল মামা। আমরা এতটা ভেবে দেখি নি।

—তা দেখবে কেন! তোমরা ভাববে শুধু বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি বিদ্যা দিয়ে সকলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার কথা। কিন্তু ডকটর কে অফ ইণ্ডিয়া সমস্ত কিছুকে দৃষ্টির আঁওতায় রেখে কাজ করে।

—আমরা আধিপত্য বিস্তার করছি কোথায় ডক্‌টর 'কে'। নিমাই কথাগুলো বলে ডক্‌টর কের দিকে তাকাল।

—ডক্‌টর কে বললেন, তোমরা নও। তোমরা নেংটি ইঁদুর হয়ে গেছ, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্যে মিটিং কর, কিন্তু বুড়ো ইঁদুরের কথা শুনে নিরাশ হও। হত্যাকারী বেড়ালকে এড়িয়ে চলার জন্যে ঘণ্টা বাঁধার চিন্তা করে চিন্তাশীলের মত কাজ

কর। তোমরা হলে ভণ্ড।

—ডক্‌টর কে অফ ইণ্ডিয়া ক্যানাডায় গিয়ে সেখানকার ইঁদুরদের জব্দ করে এলেন, এ আমাদের গর্ব। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করার জন্যে আমি বললাম। মামা তারপর সেয়ারম্যান যখন আবার নরম্যাল হয়ে গেল? কিছু বলেছিল?

—কিচ্ছুটি না। হ্যাঁ, আবার স্পিলিট ব্রেণের কথায় আসি। আমি এমন একটা ডিভাইস সৃষ্টি করলাম যার দ্বারা ইঁদুরের ব্রেণ স্পিলিট (Spilit) করা যায়। এবং একটা ব্রেণের গোলার্ধকে দৃষ্টি ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে দেওয়া যায়।

—তাতে কি হবে মামা?

—হা-হা-হা—দি ওয়াণ্ডার।

—ইঁদুরের ব্রেণ-স্পিলিট করার সব রকম ব্যবস্থা আমি গম ক্ষেতে বসালাম।

—বসাতে কতদিন লাগল মামা?

—তা তিন সপ্তাহ প্রায় লেগে গেল। ক্যানাডা বলে তিন সপ্তাহে হল, এখানে তিন বছর কেটে যেত। চলো অনেক বাজলো। হাঁটতে হাঁটতে আমরা কথা বলতে বলতে যাই, তোমাদের বাড়িতে আবার মায়েরা ভাববেন। আমরা উঠে হাঁটতে লাগলাম। মামা কিছুক্ষণ চুপচাপ চলতে লাগলেন, তারপর বললেন, বড় অদ্ভুত জিনিস হল। স্পিলিটব্রেণ এর ডিউরেশন করলাম আধ ঘণ্টা তার বেশি নয়। আমি সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে এক পেট খেয়ে ঘুমতে গেলাম। সেয়ারম্যান আগে আমার কাছে মাঝে মধ্যে এসে খোঁজ খবর নিত কতদূর কাজ চলছে। সেই ঘটনা ঘটার পর মনে হয় ওর বৌ আর ওকে আমার ল্যাবোরেটরীতে আসতে দিত না, তাই বাইরে দেখা হলে আগ্রহ করে কুশল জিগ্যেস করত আর আমার সুবিধে অসুবিধের খোঁজ নিত, তাছাড়া ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা পাবে কিনা সেকথাও

জিগ্যেস করত।

—তারপর মামা ? আপনি এক পেট খেয়ে শুতে গেলেন।

—একটা কথা ত' তোমাদের বলতে ভুলেই গেছি। ফার্মের মালিক একদিন নাছোড়বান্দা হয়ে আমায় ডিনারে আমন্ত্রণ করলেন। সে এক এলাহী খাওয়া ভাই, সব খাও কুছ পরোয়া নেই। তা খাওয়ার মধ্যে গল্প করতে করতে এক সময় বললেন, ডক্টর 'কে' আমরা জানি আপনি অসাধ্য সাধন করেন··· গমগুলো পাকতে আর দেরী নেই এর মধ্যে যদি আপনার কাজ শেষ হয় তাহলে আমরা বহু টাকার ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারি। অবশ্য এত কম সময়ের মধ্যে আপনার কাজ শেষ হওয়ার অনেক অসুবিটে আছে তা আমরা জানি, তাই আমরা আশা করি না এ ফসলটা রক্ষা করতে পারবো। পরের ফলন থেকে রক্ষা পেলেই আমি এবং সমস্ত কানাডার মানুষ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

—ওরা ত' খুব অমাইক মামা। আমি বললাম।

ডক্টর কে একটু অন্য রকম গলার স্বর করে বললেন, অমাইক হবে না ত' কি ? ওরা উন্নত জাতি, বিশ্বের বাজারে ওদের আনাগোনা করতে হয় মাল কেনা বেচার জন্যে। ওরা ধার খেয়ে খেয়ে মাথা গরম করে ফেলে নি।

—মালিকের নাম কি মামা ?

—ঠিক খেয়াল নেই তবে যতদূর মনে হয় নরম্যান পিগি। যাই হোক নাম। অত পয়সার মালিক কিন্তু মাথা ঠিক ঠাণ্ডা।

—নরম্যান পিগিকে আশা দিলেন মামা ?

—তোদের কি মনে হয় ডক্টর কে অফ ইণ্ডিয়া সময় কম বলে কোন কাজ শেষ করতে পারবে না—নো নেভার।

—সত্যি ত'।

—সকাল বেলা আমি সেদিন দেরী করে ঘুম থেকে উঠলাম। দেখি সেয়ারম্যান আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। আমি

জিগ্যেস করলাম কেমন আছে? বলল, ভাল। এ সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের গম পাকতে আরম্ভ করবে, তখন আপনার স্টাডির জন্যে আমাদের গম ক্ষেতে আপনাকে যেতে আমি অনুরোধ করতে এসেছি। গেলে আপনার কাজের সুবিধে হবে তাই মিস্টার নরম্যান আপনার জন্যে একটা আলাদা গাড়ি সব সময়ের জন্যে আমাকে ছেড়ে দিতে বলেছেন।

—আপনি কি বললেন মামা?

আমি সেয়ারম্যানকে বললাম, ননসেন্স! ইঁদুর তোমার গম ক্ষেত কেটে সব মাল পাচার করবে আর তাই দেখতে আমাকে গাড়ি চড়ে চড়ে যেতে হবে।

—তাতে সেয়ারম্যান কি বলল?

—ও পাগল। হেসে আরও দু চারটে কথা বলে চলে গেল। গাড়িটা রইল, আমি গাড়ি চড়ে দু'চার দিন সহর ঘুরলাম। এক দিন গাড়ি করে একটা খামারের পাশ দিয়ে আসছি। দেখলাম দুদিকে পাকা গমের ক্ষেত সোনা ছড়াচ্ছে। বাড়ি ফিরে নিজের কণ্ট্রোল রুমে গেলাম। অটোমেটিক কণ্ট্রোল সব নিখুঁত।

মামা থামলেন। সিগারেট বার করে ধরালেন।

—দুদিন পর আমি একবার গাড়ি করে সেয়ারম্যানদের হুইট ফিল্ড ঘুরে এলাম। তা এক পাক চক্কর দিতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। গম সুন্দর পাক ধরেছে…দেখে মনটা জুড়িয়ে গেল। তারপরের দিন সেয়ারম্যান পানীয় আর এক ঝুড়ি আপেল নিয়ে এসে হঠাৎ ইণ্ডিয়ান প্রথায় আমায় নমস্কার জানালো। ভাগ্যিস আমার পায়ে হাত দেয়নি। আমি প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এগুলো নিয়ে এলে ব্যাপার কী?

সেয়ারম্যান একটু মুচকি হাসল, এমনি ডক্‌টর কে।'

—আমি বুঝতে পারলাম পাকা গম গাছগুলো গমের ভারে নুয়ে পড়েছে, ইঁদুরগুলো দলে দলে আনাগোনা করছে, তবু

দাঁতে একটা গাছও কাটছে না দেখে সেয়ারম্যানরা অবাক হয়ে যাচ্ছে।



…যে নেট্ওয়ার্ক বিছিয়েছিলাম

আমি বললাম, তোমরা গম কবে কেটে তুলবে ?—বলল পরশু।

বললাম, পবশু কটার সময় তুলবে আমায় খবর দিয়ে যেও।

—আপনি এমন প্রশ্ন কেন করলেন মামা…কটার সময় তুলবে ?

—বাঃ বাঃ। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলার কাছে চলে এসেছি। ভালই হল এক সঙ্গে সাউথের ট্রামে উঠব যে যার জায়গায় নেমে পড়ব।

ডক্টর কে বললেন, গম কাটার আগে, আমি খামাবে যে নেট ওয়ার্ক বিছিয়ে ছিলাম, যে কারণে ইঁদুরগুলো গম গাছ কাটতে পারে নি, সেই নেট ওয়ার্ক গুটিয়ে নেব তাই সময় জিগ্যেস করেছিলাম।

—আচ্ছা মামা আপনি এমন একটা ব্যবস্থা করে- ছিলেন যাতে ইঁদুর ক্ষেতে ঢুকলেই সাময়িকভাবে স্পিলিট ব্রেণ হয়ে যায়.?

—শুধু স্পিলিট ব্রেণই নয়। আমার ব্যবস্থায় দৃষ্টি-ক্ষেত্রের সীমা বেঁধে দিয়ে ছিলাম। Optic Chiasm-র একটা বিন্দুকে

নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে সাময়িক ভাবে প্যারালাইজ করে শুধু একটা ব্রেণেরই সঙ্গে দৃষ্টিক্ষেত্রের সংযোগ রক্ষা করে, এমনভাবে ব্যবস্থা করেছিলাম। তাই ইঁদুর গুলো যখন গম ক্ষেতে ঢুকতো ওরা সম্পূর্ণ গাছ কখনই দেখতে পেত না। গাছের গোড়া দেখতে পেত না।

—ওদের কী মনে হত মামা?

—ইঁদুর গুলোর মনে হত গম গাছগুলো কাটা অবস্থায় রয়েছে। তাই ওরা আর কাটার প্রয়োজন বোধ করত না। এসে ঘুরে ফিরে চলে যেত।

—কেন মামা ঘুরে ফিরে চলে যেত? ওরা গম গাছগুলো নিয়ে যাবার চেষ্টা করত না কেন?

—হা-হা-হা। এই প্রশ্ন সেয়ারম্যান করেছিল। এই প্রশ্ন ওর মালিক করেছিল। —সে কি খাওয়া রে! আমি যেদিন চলে আসছি আমায় ওরা ক্যানাডায় বসে ল্যাংড়া আম খাওয়ালো। তাছাড়া আমার খাতির দেখলে তোরা অবাক হতিস। চল একটু তাড়াতাড়ি, ওই ট্রামটা খালি মনে হচ্ছে।

আমরা ট্রামে উঠে পড়লাম। মামা আবার সামনে ওঠেন না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর এলগিন রোডের কাছে আমি আর নিমাই মামার পাশে বসতে জায়গা পেলাম।

—ওই সিক্রেটটুকু ওদের কারুকেই বলিনি, কেন ওরা গম নিয়ে চলে যায়নি। একজন আবার বলেছিল, এত খরচ করে এই সমস্ত করার কি দরকার। বিষ স্প্রে করলেই ত' কাজ হত। সব ইঁদুর মরে যেত।

সেয়ারম্যান হেসে বলেছিল, তাহলে বহু ক্যানেডাবাসী বিষের এফেক্টে মরত। তাছাড়া হাজার হাজার ইঁদুর মরে আরও একটা অন্য রকম রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকতো। মিউনিসি-প্যালিটি আমাদের বিরুদ্ধে কেস করত। তাছাড়া ওটা খুব ক্রুড মেথড। ইঁদুর বুঝল না। ইঁদুরের চালকরা যারা গম চুরি করাত

তারা বুঝল না, ট্রেণ্ড ইঁদুর গম নিয়ে যায় না কেন।

আমি বললাম, কাটা গম গাছ দেখে ইদুর গুলো গম গাছ কাটে নি কিন্তু গম দাঁতে করে তুলে নিয়ে যেতে আপত্তি কি ?

নিমাই বলল, ইঁদুর গুলোর ট্রেনিং ছিল গম গাছ কেটে নিয়ে আসবে। কিন্তু বেচারীবা যখন গম ক্ষেতে ঢোকে তখন দেখে গম গাছ কাটা তাই ওদের আর ও কাজ করার দরকার হয় না। মনে হয় ওরা দাঁতে কাটতে ভাল বাসে তাতে বাধা পড়তে ওদের পরবর্ত্তী আদেশ কার্যকরী হয় না।

—তুমি কতকটা ভেবে ঠিক বলেছ নিমাই—ও হো—হো আমার স্টপেজ চলে গেল।

মামা তাড়াতাড়ি উঠে ট্রামের দরজার কাছে গিয়ে, এক শিখ ভদ্রলোককে ঠেলে সরিয়ে সদ্য স্টার্ট নেওয়া ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেমে গেলেন। মামার ডাইরিটা আমার হাতে ছিল কারুর খেয়াল নেই। আমি তাড়াতাড়ি জানালার কাছে সরে গেলাম—মামা—? মামা তখন অনেকটা দূরে গিয়ে ফুটপাথে উঠে চশমা ঠিক করছেন। আমার ডাক কানে গেল না।

———

ডক্টর কের ডাইরি থেকে…

পরের দিন আমি ডকট্‌র কের ট্রামে ফেলে আসা ডাইরি নিয়ে নিমাইয়ের বাড়ি গেলাম। নিমাই বলল,—কি রে হারুণ ?

আমি হাসলাম ঠিক ধরেছিস মামার ডাইরিটা চল ফেরৎ দিয়ে আসি।

আমরা ট্রামে করে ডক্টর কের ডাইরিটা পড়তে পড়তে গেলাম।

V/2—17 67 SA 19

—যে যাযাবর পরিবার ১৯০৮ সনে সাইবেরিয়ার টাঙ্গাস্কা মালভূমির অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করত তাদের পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি যখন সেয়ার-ম্যানের খামারের কাজ শেষ করে একা একদিন উইনিপেগ হ্রদের কাছে বসেছিলাম তখন মেয়েটি হ্রদের জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল।

—আমি নিউইয়র্কে এলাম সঙ্গে এল তুনিয়া। (মেয়েটির নাম তুনিয়া)। ভারী চমৎকার মেয়ে।

—১৯০৮ সনের সকাল বেলা টাঙ্গাস্কা মালভূমির অরণ্যে যে প্রচণ্ড উল্কাপাত হয় তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তুনিয়ার দাদু আর ঠাকুমা। সেই ভীষণ আলো আর শব্দে তুনিয়ার ঠাকুমা বধির হয়ে গিয়েছিল, দাদুর চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে যায়। ওদের যত রেনডিয়ার ছিল তারা ভয়ে পালায়, কিছু মরে যায়। সেই উল্কাপাতের ফলে ২৫ মাইল ব্যাস জুড়ে জঙ্গলের গাছ উপড়ে মাটিতে পড়ে। তুনিয়া বলেছিল হিরোসিমার এটম বমের চেয়েও এর শব্দ ছিল আরও প্রচণ্ড।

আমি ওর কথায় আমল দিই নি। তুনিয়ার বাবা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। এবং এই পঙ্গু হওয়ার জন্যে পরবর্তী যাযাবর জীবন থেকেও মুক্তি পেয়েছিল। মস্কোর এক হাসপাতালে ওর বাবা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠেছিল। একটা লাঠির সাহায্যে চলাফেরা

করতে পারত। তারপর থেকেই তার জীবনের গতি অন্য পথ নেয়।…থাক সে কথা। তুনিয়ার সঙ্গে আমার যখন দেখা তখন ওর বাবা তুনিয়ায় নেই। ও লেখাপড়া শিখেছে। টাইপিষ্টের কাজ করেছে লণ্ডন শহরে। কিন্তু উইনিপেগ হ্রদে কেন এসেছিল সে কথা কিছু বলে নি।

ওর সঙ্গে দেখা হতে মনে হয়েছিল যেন ওর অপেক্ষায় আমি ছিলাম। ১৯০৮ সনে যে উল্কাপাত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমার বহুদিনের অপূর্ণ অনুসন্ধান হয়ত পূর্ণ হবার সময় এসেছে তাই এই সাক্ষাৎ। কারণ আমি জানতাম উল্কাপাতের সময় যে শব্দ হয়েছিল তার আওয়াজ ২৫০ মাইল দূরের লোকেরাও শুনতে পেয়েছিল। আমি এমন একজন লোককে খুঁজছিলাম যে সে শব্দ শুনেছে। তুনিয়া শোনে নি কিন্তু ও বলতে পারে ওদের যাযাবর জাতির মধ্যে নিশ্চয় কেউ আছে যে শুনেছে। টাঙ্গাস্কা মালভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে আরও যাযাবর পরিবার তাঁবু ফেলে বাস করছিল সে সময়, আমি জানি।

সারা পৃথিবীর সিসমোগ্রাফ আর ব্যারোগ্রাফে ওই প্রচণ্ড শব্দের এফেক্‌ট ধরা পড়ে। ওই ঘটনার পরে বেশ কয়েক রাত ইউরোপের আকাশ এবং উত্তর এশিয়ার আকাশ রূপালী মেঘে ঝলমল করতে থাকে। এই সমস্ত ডেটা জোগাড় করে আমি রেখেছিলাম।… ১৮৮৩ সনে আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্‌গারে যে শক্তি ছিল, যার দ্বারা ক্রেকোটোয়া দ্বীপ উড়ে গিয়েছিল—এর শক্তি ততটাই।

আমার মনে হয়েছিল এটা উল্কাপাত জনিত দুর্ঘটনা নয়। কারণ উল্কাপাতের কোন চিহ্ন সাইবেরিয়ায় ছিল না। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ডেটাতে পাওয়া যায়, উল্কাপাতের কোনও চিহ্ন মাটিতে নেই। তবে কাঁচের মত দেখতে মাইক্রো অর্ডারের ছোট ছোট বহু বল ওই সমস্ত স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সেই বল আমাকে সংগ্রহ করতে হবে। বহুদিনের ব্যাপার—

একটা ব্যাপার হয়েছে তুনিয়াকে নিয়ে। আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসবে। বলেছিল, আমার কোন বন্ধন নেই, আমার ইচ্ছে আপনার সঙ্গে ভারতবর্ষে চলে যাব—এদেশ আর আমার ভাল লাগছে না। কেন? কেন জবাব দেয় নি তুনিয়া। আমার মনে হয়েছিল ওর শরীরে যাযাবরের রক্ত তাই একস্থানে ওরা টেঁকতে পারে না।

এদিকে আমি ব্যস্ত ছিলাম। কিছু বৈজ্ঞানিকের ধারণার সঙ্গে আমার ভিন্নতা ছিল না। ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংযোগে যে বিরাট explosion তার প্রতিক্রিয়া চিন্তাশীল বিজ্ঞানী-দের দিক্ সংকেত করেছিল। পৃথিবীর সঙ্গে কস্মিক (cosmic) বস্তুর সংঘর্ষ বিশেষ বিশেষ সময়ের ব্যবধানে ঘটে। অতীতে এর দৃষ্টান্ত আছে। এই ঘটনা অন্য এক ঘটনাকে প্রতিরোধ করার জন্যেই ঘটে কিনা কে জানে।

বেশ কিছু অনুসন্ধানে জানা গেছে, পৃথিবীর চুম্বক, মেরু (Pole) পরিবর্তন করে। এবং এই মেরু পরিবর্তনের সঙ্গে এক ধরণের ছোট সামুদ্রিক জীব বংশ বৃদ্ধির গতি পরিবর্তন করে। সামুদ্রিক এই জীবের সঙ্গে সূত্র সংযোজন করে দেখা গেছে সাত লক্ষ বছর আগে পৃথিবী একবার চুম্বক মেরু পরিবর্তন করেছিল। ক্যানাডার উপেনের সঙ্গে এই ব্যাপারে আমি একবার দেখা করব। উপেন এর ওপর ভাল কাজ করেছে।

…যে সমস্ত কাঁচ জাতীয় ছোট ছোট বল অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতল থেকে ওঠানো হয়েছিল, তাদের কোনটা ডামবেলের মত কোনটা একেবারে গোল। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সমুদ্র তল থেকে সংগ্রহ করা আরও টেকটাইটের জন্ম লগ্নের সময় অনুসন্ধান করা হয়। এবং দেখা গেছে, রেডিও আইসোটোপিক নিরীক্ষায় তাদের গলিত হবার সময় 700000 বৎসর পূর্ব্বে।

সাত লক্ষ বছর আগে কি ধরণের কসমিক বস্তু পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে প্রবেশ করেছিল, সে প্রশ্ন রয়ে যায়—এটা কি একটা উল্কা

না ধূমকেতু! পুচ্ছ বিশিষ্ট ধূমকেতু হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল না গ্রহ উপগ্রহের ধাক্কায় একটা চাঁই এসে ছিটকে পড়েছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে! এসব প্রশ্নের সমাধান আমি করব,—সময় লাগবে।

সেদিন আমি লেবোরেটরীতে নিজের মনে কি একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তুনিয়া কফি পট নিয়ে ঢুকল।

এই মুহূর্তে আমার কফি পেলে খুব ভাল হত এটা তুনিয়া কি করে বুঝতে পেরেছে! কিছুদিন হল ও আমার অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে কাজ করছিল। ও অ্যাসিস্টেন্ট হওয়াতে কতগুলো জিনিস আমাকে আর ভাবতে হত না, তার মধ্যে প্রধান খাওয়া এবং কোন্ চিঠিটার জবাব কখন দিতে হবে বা কি দিতে হবে। ক্যানেডা ছেড়ে আমি যখন স্টেট্‌সে যাই, দুদিন ও ছুটি নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল তারপর আবার আমার সঙ্গে গিয়েছিল।

তুনিয়া বলেছিল ওর কাকা ১৯০৮ সনের সাইবেরিয়ার জঙ্গলের ওপর উল্কাপাতের শব্দ শুনেছে। নিউ ইয়র্কে যাবার আগে যে দুদিন ও বাইরে গিয়েছিল তারমধ্যে কাকার সঙ্গে দেখা করে এসেছে।

বলল ওর কাকা উইনিপেগে থাকে। —কেন? সাইবেরিয়া অঞ্চলের বেদুইন উইনিপেগে এল কেন? —জিপসী! জিপসীরা সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ায়। হোক। ইউরোপের জিপসী কদাচিৎ এশিয়ায় আসে। এশিয়ার জিপসী এশিয়ায় ঘোরে। কখন কখন বিশেষ স্থানে বসবাসও করে। —হোয়াই? কেন, আমায় কুরে খেল। আমার সন্দেহ হয়েছিল তুনিয়ার কাকা এই গম পাচারকারী ইঁদুরের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। তাই তুনিয়া এসেছে আমার কাছে কাজ করতে। জানতে চায় কী করে আমি সেয়ারম্যানের খামারের ইঁদুর তাড়িয়েছি—বা পরে দরকার হলে স্যাবোটেজ করবে।

ও যখন কাকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল আমাকে বলে নি,

বললে অন্য ব্যবস্থা করতাম। সঙ্গে একটা মাইক্রো টেপরেকর্ডার গোপনে দিয়ে দিতাম ও জানতে পারত না।

আমার দেশে ফিরে আসার জন্যে মন কেমন করছিল তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম। তুনিয়াকে ঠিকানা দিয়ে এসেছি ও চিঠি দেবে···ওকে সঙ্গে নিয়ে আসি নি—ওর মনের গোপন উদ্দেশ্য কী জানি না···অনেক বার আমায় অনুরোধ করেছিল···আমি যাব। বলেছিলাম তুমি তোমার কাকাকে জিজ্ঞেস করেছ ? ···বলেছিল কাকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ—কি জানি কথাটা সত্যি না মিথ্যে ! আমি যেদিন চলে আসি এয়ার পোর্টে তুনিয়া খুব কাঁদছিল···।

পড়তে পড়তে আমরা একটা স্টপ ছাড়িয়ে গেছি। হুড় মুড় করে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। ডাইরি আর পড়া হল না।

ডকটর কঁয়ালের ল্যাবোরেটরীতে (বাড়ি) গিয়ে ভেমোর কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম—মামা একটা কাঠবেড়ালীকে কাঁঠাল খাওয়াচ্ছেন।

ঘর ছাড়িয়ে পেছন দিকের বারান্দায় গিয়ে দেখলাম মামা খালি গায়ে বসে কাঁঠালের কোয়া নিয়ে একটা কাঠবেড়ালীকে তন্ময় হয়ে খাওয়াচ্ছেন কোন দিকে নজর নেই। ডাইরিটা যে একটা মূল্য—বান সম্পদ, হারিয়ে গেছে তার জন্যে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কিছুক্ষণ পর মামা আমাদের দিকে তাকালেন। —তোরা আসবি আমি জানতাম। —ডাইরিটা রেখে চলে যা।

কাঠবেড়ালীটাকে দেখিয়ে বললেন, ওকে দেখ ও ভয় পাচ্ছে। ওর বড় ভয়। বাঘের ডাক একেবারে সহ্য করতে পারে না, তাই এদিকটায় নিয়ে এসে রেখেছি।

—কেন মামা ওদিকে আপনার পাশের বাড়িতে কেউ বাঘ পুষেছে ?

—না ওদিকে কাঠ বেড়ালীটাকে রাখি না, ওপাশে পশুপতি বাবুর কলতলা—ঠিক আমার পাঁচিলের ওপাশে। ওকে আমি সাউণ্ড-

প্রুফ খাঁচা করে দেব।

—তা পশুপতি বাবুর কলতলা ত' কী হয়েছে ?

—সকালে উঠে উনি যখন মুখ ধোন তখন গলায় আঙুল দিয়ে জিব পরিস্কার করেন।

—তাতে যে শব্দ হয় কাঠবেড়ালী ভয় পায় বুঝি ? আমি প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ ওর মাকে একটা চিতা বাঘ ওই রকম শব্দ করে কুমায়ুঁ জঙ্গলে এক থাবায় মেরে ফেলে ছিল···ও কুমায়ুঁর কাঠ বেড়ালী···।

ডকটর কে আর কোন কথা বললেন না কাঠ বিড়ালীর দিকে মন দিলেন কিছুক্ষণ পর আমরা দুজনে চলে এলাম।

———